শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

—oo—

১০৭নং আপার চিৎপুর রোড, "বাল্মীকি পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল।

রচয়িতার নিবেদন।

নবনলিনী মাসিক পত্রিকায় (তাপসী-কণ্ঠহার) এই উপ-ন্যাসটির দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলাম; তাহার পর আর প্রকাশিত হয় নাই। এখন পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল। যখন নবনলিনী পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইতেছিল, তখন নবনলিনী সমালোচনার সময় প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র "সুরভি ও পতাকা" (১২৯২ সালের ২রা মাঘের কাগজে) লিখিয়াছিলেন; "তাপসী-কণ্ঠহার" নামক একটি উপন্যাস সংখ্যাক্রমে বাহির হইতেছে। যতটুকু বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের বড় ভাল লাগিল।" এখন সম্পূর্ণ অংশ পাঠকের কিরূপ লাগিবে জানি না।

মনুষ্যহৃদয়ের সুরুচি ও সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিয়া দেখানই উপন্যাসের কার্য্য। চিত্তের নির্ব্বিবাদ স্ফূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যানুভূতি। 'এই মানসিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ বস্তুই সুন্দর, তাহা উপন্যাসে হয়। এই জন্যই বুঝি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপন্যাস পড়িতে ইচ্ছুক, এজন্যই বুঝি প্রাচীন ঋষিগণ কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি রাজনীতি; কি সমাজনীতি সমস্তই উপন্যাসাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসে গাথা বলিয়াই বুঝি ভারতের স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা সকলেরই নিকট ধর্ম্মের মর্ম্ম, রাজনীতির কুটিল কৌশল, সমাজের নিয়ম সকলই উপন্যাস গুলিতে পাওয়া যায়। বুঝি এই জন্যই বঙ্গের প্রধান লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত

তত্ত্বই উপন্যাসে লিখেন। আমিও সংসারের পথে যেতে যেতে যে সকল অত্যাচার, ধর্ম্মের ভাব, সমাজের চিত্র দেখি, তাহা দু'খানি পাতায় গাঁথিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিই।

তাপসী-কণ্ঠহারের পাণ্ডুলিপি বাল্মীকি পুস্তকালয়েরর প্রোপা-ইটর শ্রীযুক্ত নবকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিলাম; সুতরাং ইহাতে আমার নাম ব্যতীত আর কোন স্বত্ব থাকিল না। ইতি

অনন্তপুর
২রা নবেম্বর ১৮৮৭। } শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য।

সহাই বঙ্গবাসী জাতীয় ভাব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে, সামাজিক শিথিলতার কারণ যে বিজাতীয় ভাব তাহা বুঝিয়াছে; নতুবা সমাজ-জ্ঞান-সংস্কারক বিজাতীয় ভাব বৰ্জ্জিত "তাপসী কণ্ঠহার" উপন্যাস ছয় মাস মধ্যে কেন দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে একণে পূর্ব্ববৎ গ্রাহকগণ সমীপে উৎসাহ পাইলেই শ্রম, অর্থব্যয় সকলি সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি।

প্রকাশক।

তৃতীয় সংস্করণের বক্তব্য।

কে ভাবিয়াছিল যে তাপসীকণ্ঠহার বঙ্গবাসীর কণ্ঠভূষণ হইবে? সাহিত্যানুরাগী মহোদয় গণের আগ্রহে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহা পুনর্মুদ্রন আবশ্যক হইবে ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি না। একণে স্বদেশ বাসীর নিকট পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় উৎসাহ পাইলেই চরিতার্থ জ্ঞান করিব ইতি।

প্রকাশক।

তাপসী-কণ্ঠহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্লীর জমীদার।

"ঝি ও ঝি!"

আবাগে মাগী গেল কোথারে,—

"এই যে বাবু" ঝি উত্তর দিল।—বাবু বলিলেন, "এদিকে একবার পাঠাইয়া দেত।" ঝি যথাস্থানে নিবেদন করিল। গজ-গামিনী গৃহিণী গহনার শব্দ করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে বাবুর নিকট আগমন করিলেন।

বাবুর নাম হরকান্ত রায় নিবাস এই সদরপুর। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। ইনি এই প্রদেশের জমীদার; বলা বাহুল্য যে, মফঃস্বলের—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের জমীদার দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী (গৃহিণীর নিকট বড় নহে)

গৃহিণী আসিয়া রাগে রাগে কহিলেন, "মরণ আর কি—অমন করিয়া ডাকা হইতেছিল কেন?"

হর। কাজ না থাকিলে কি আর ডেকেছি।

গৃহিণী। তোমার ত সকল সময়ই কাজ, কি বল।

হর। আর ত জাতিকুল থাকে না।

গৃহিণী। ওমা সে কি! কি হয়েছে?

হর। জাননা, ঐ যে তোমার শিক্ষিত—যাহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া—পুত্রসম যত্ন করিয়া—লেখাপড়া শিখাইয়াছিলে, সেই বিশ্বাসঘাতক নরাধম নরেন্দ্র, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিমুগ্ধা সরলস্বভাবা বালিকা শতদলকে প্রণয় জ্ঞাপক পত্র লিখিতেছে। ওঃ! আর সহ্য হয় না; দেখ, আমি যাহাতে পারি সেই পিশাচ নরেন্দ্রকে জেলে দিব। আর জেলেই বা দিতে গেলেম কেন? যখন আমি এ দেশের জমীদার তখন আমার কাছে আবার জেল কেন কি?

গৃহিণী। তুমি কার কাছে শুনিলে?

হর। শুনিতে কি আর বাকি থাকে।

গৃহিণী। কৈ কিসে জাতিকুল গেল তাত বলিলে না।

হর। এই ত বলিলাম।

গৃহিণী। ইহারই জন্য এত ডাকাডাকি? তুমি এখন শোও রাত্রি অনেক হয়েছে।

হর। কথাটা বুঝি তোমার গ্রাহ্য হইল না? হইবে কেন তুমিও যে উহার সুপক্ষ।

গৃহিণী আর কোন কথা কহিলেন না, ফর্‌ফর্‌ করিয়া রন্ধনশালায় গমন করিলেন। হরকান্ত রায় কি করেন অগত্যা সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি শয়ন করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে গৃহিণী ঠাকুরাণী আহারাদি ক্রিয়া সমাধানান্তে শয়ন গৃহে পুনরাগমন করিলেন। হরকান্ত কহিলেন, আমার কথাটা বুঝি তোমার মনে লাগিল না।

গৃহিণী একটু হাসিয়া হাতের অলঙ্কার গুলি বারকতক নাড়িয়া কহিলেন "কি ?"

"নরেন্দ্রের সহিত শতদলের বিবাহ দিবার ইচ্ছা তোমার আছে নাকি ?" হরকান্ত রায় এই কথা বলিলে, গৃহিণী কহিলেন "আমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কি আসে আর যায়, তোমার মত কি ?"

হর। কেশরী—কন্যেপ্সু শৃগাল—শাবকের উপর কেশরীর যে মত, নরেন্দ্রের উপর আমারও সেই মত।

গৃহিণী। সে কি ! তার মা বাপের যে আর কেউ নাই; সে যে কাঙ্গালের ছেলে।

হর। তবে আবার কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়া রোগ কেন ?

গৃহিণী। তাহার ঘোড়ারোগ দেখিলে কিসে ? তোমার মেয়ের যে সকল গায়েই রোগ; আপনার জনের দোষ তত গ্রাহ্য হয় না, তাই পরের ছেলের দোষ বড়ই বোধ হয়। দেখ, নলিনী যদি ভ্রমরকে হৃদয়ে বসিতে না দেয়, তবে কি ভ্রমর জোর করিয়া নলিনীর মধু খেতে পারে ? নলিনী প্রাণখুলে ভ্রমরকে মধু দেয়, না এলে কাঁদে, পোড়া লোকে দোষ দিতে ভ্রমরেরই দেয়, যে ভ্রমর বড় লম্পট। কই ভ্রমর ত কেতকীর মধু খায় না।

হর। এখন মেয়ের মত বল্লেই কি বিবাহ দিতে হইবে নাকি ? বড় কর্ত্তার মত গেল, মেজ কর্ত্তার মত গেল, আমার মত গেল, কুটুম্ব সাক্ষাতের মত গেল; পুরোহিত ঠাকুরের মত গেল; হ'ল কিনা মেয়ের মতে বিবাহ হইবে। হায় কলিকাল। আর মেয়ের যে মত হয় কিসে তাহাও ত বুঝিতে পারি না; কলিকাতায় এমন সম্বন্ধ হইতেছে, কত গহনা দিবে, কত আদর

করিবে, কত সুখে থাকিবেন, তাহাতে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা কি না একটা ভিখারীর সঙ্গে, ধিক্ তাহার ইচ্ছায়!!!

গৃহিণী। শুধু তাহারও নহে, বৈকুণ্ঠেরও বড় ইচ্ছা। বৈকুণ্ঠ বলে যে, প্রণয়ের নিকট ধনী দরিদ্র নাই, সুশ্রী কুশ্রী নাই, বিদ্বান্ মূর্খ নাই; যাহাকে যে ভালবাসে তাহার সহিত সে বনে, রণে, প্রতপ্ত মরুভূখণ্ডে—দিবসান্তে শাকান্ন খাইয়া—বৃক্ষতলায় তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াও সুখে কালাতিপাত করে। আর ভালবাসা বিহনে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া ত্রিতলোপরি সুসজ্জিত পালঙ্কে বসিয়া নবনীতাদি আহার ও দাস দাসী দ্বারা সেব্যমান হইলেও সুখী হওয়া যায় না। দেখ শতদল নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসে নরেন্দ্রের কথা পড়িলে হাঁ করিয়া শুনে। সে দিন নরেন্দ্রের ব্যারাম হইয়াছিল, বৈকুণ্ঠের মুখে শুনিয়া শতদল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল। তাই বলিতেছি আর অমত করিও না, বিবাহ দাও।

"আবার ঐ কথা, আচ্ছা আমি ইহার প্রতিকার কালই করিব। যাহাতে সে পাষণ্ড নরেন্দ্র নাম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয় তাহার চেষ্টা করিব, নতুবা আর জাতিকুল, মানমর্য্যাদা থাকে না।" এই বলিয়া হরকান্ত রায় নীরব হইলেন। গৃহিণী কত ডাকিলেন, কত সাধিলেন, হরকান্ত রায় কথা কহিলেন না। ক্রমে রমণীসুলভ মহামান আসিয়া গৃহিণীর স্কন্ধে ভর করিল, মানে বিভোর হইয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী পাশ ফিরিয়া বালিশটীকে গুটী দুই কোমল কোষ তুল্য কোমল চরণের কোমল আঘাত করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—oo—

নরেন্দ্রনাথ।

মলিন-বসন-পরিধানা, রুক্ষ-কেশা, পতি-পুত্র-বিহীনা, দুঃখিনী বৃদ্ধার ন্যায় ধীরে ধীরে ভৈরবী নদী বহিতেছে। তীরে নানাবিধ তরুরাজি রবিকর শিরে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেন বিন্যস্ত ঠেসাঠেসি মিশামিশি পল্লবরাশি হইতে, মৃদুল সমীরভরে পাকা পাতা পাঁতি খসিয়া সর্ সর্ টুপুস্ টাপুস করিয়া ভূমিতলে পড়িতেছে। শ্যামলকায় নব পত্রগুলি ফলফুলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। প্রসূননিচয় বাল-স্বভাব বশতঃ হাসি সম্বরণ করিতে না পারিয়া এক এক বার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেছে। পাপিয়া, চাতক, শ্যামা প্রভৃতি পাখিগণ, দেহো পরি-স্বভাবজ রাগ মাখিয়া সারি সারি বসিয়া পঞ্চম স্বরে গীত গাইতেছে।

ইহার কিছু উত্তর ভাগে মালতী নামক ক্ষুদ্র পল্লী। গ্রামে প্রায়ই ইষ্টকালয় নাই—একটী মাত্র আছে—তাহার অবস্থাও অতীব শোচনীয়। যেমন ফল-ফুল-বিভূষিত তরুবর, প্রবল ঝটিকাঘাতে ডালে মূলে ভগ্ন হইলে, অথবা হিন্দু যুবতী নববিধবা হইয়া অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিলে কিম্বা বিজয়া দশমীর দিনে মৃণ্ময়ী প্রতিমার অঙ্গ হইতে ডাকের সাজ খুলিয়া লইলে তাহাকে যেরূপ দেখায়, ইহারও সেইরূপ অবস্থা। লতাজালে চারি ধার আবৃত করিয়াছে, প্রাচীরে ছোট ছোট বটাদি তরু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, খাঁজে খাঁজে তৃণাবলী জন্মিয়াছে।

কোন গৃহের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কাহারও বা আড়া বরগা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপিও এখানে—এই ভগ্নাশ্রমে—লোকের বসতি আছে। ইহার একটী সদর প্রকোষ্ঠে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন। ইহা নরেন্দ্রদিগের বাড়ী।

নরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম একবিংশ বর্ষ। নরেন্দ্র দেখিতে অতিশয় সুন্দর,আর যে সৌন্দর্য্যে মনুষ্য সুন্দর হয়,সে সৌন্দর্য্যও নরেন্দ্রতে সুন্দর রহিয়াছে—নরেন্দ্র বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, পরোপকারী ও ধর্ম্মজ্ঞ।

নরেন্দ্রনাথ একাগ্র মনে সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন, এমন সময় একজন লোক, বাহির হইতে ডাকিল, "নরেন্ বাবু বাড়ী আছেন?"

"কে গা?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন। লোক বলিল "আমি রায় মহাশয়দিগের চাকর; আপনার একখানি পত্র আছে।" নরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া পত্র পাঠ করতঃ লোকটীকে বসিতে বলিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন। বাটীর মধ্যে নরেন্দ্রের আর কেহ নাই, কেবল মা আছেন। নরেন্দ্রনাথের পিতা আজিও বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি বাটীতে থাকেন না বিদেশে চাকুরী করেন। এতদ্ভিন্ন নরেন্দ্রনাথের সপ্তদশ বর্ষীয়া-ভগ্নী আছে—ভগ্নীটীর নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী এখন শ্বশুরালয়ে আছে। নরেন্দ্র বাটীর ভিতর গমন করতঃ জননীকে কহিলেন, "হরকান্ত রায় পত্র লিখিয়াছেন—তিনি আমার জন্য একটী চাকুরী স্থির করিয়াছেন, আমাকে অদ্যই যাইতে হইবে।" মাতা নিষেধ করিলেন, আজ আর যাওয়া হইবে না। নরেন্দ্র বলিলেন, "আজ না গেলে নয়। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,

তাঁহার একটী আত্মীয় তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমার চাকুরী করিয়া দিবেন; অতএব আমাকে অদ্যই যাইতে হইবে। আবার হয় ২।১ মাস মধ্যে আসিব। দেখ মা! বাবা এই বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে থাকিয়া কত ক্লেশে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন, আর আমি তাই গৃহে বসিয়া বসিয়া ধ্বংস করিতেছি। এখন আমি যদি কোন স্থান হইতে দু পয়সা আনিতে পারি, তবে বাবার অনেক সাহায্য হইবে—আর আমি তাঁহার বসে কি করিব?"

পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া জননী একবারে হর্ষ বিষাদে বিগলিত হইলেন, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল—বলিলেন "নরেন। আজকার দিনটাই না হয় থাকিয়া যাও।" নরেন্দ্র বলিলেন, "না মা! তা হইলে সে বাবুটী চলিয়া যাইবেন আর কিছুই হইবে না। আশীর্ব্বাদ করুন, অতি সত্বরেই আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। মা! দরিদ্রতাই সকল সুখের বিঘ্নকারক। আমাদের অবস্থা যদি পূর্ব্বকার মত থাকিত, তা হ'লে কখনই আপনার শ্রীচরণ নিকট হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইত না। জননি! আপনাকে একা রাখিয়া—সতত আপনার রাজীব-পদ সেবা করিয়া,—সামান্য অর্থের জন্য বিদেশে গমন করিতেছি, ইহা কি সামান্য দুঃখ! তবে কি করিব মা! সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা।" তখন জননী অশ্রুবিগলিত নেত্রে পুত্রের মুখ প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "তবে কি এখনই যাইবে?"

নরেন্দ্র। "হাঁ! আপনি আমার কাপড় ইত্যাদি আনিয়া দিন।"

"তবে শীঘ্র শীঘ্র এস, মণিহারা ফণিনী যেমন উন্মাদিনী হয়,

তোমা বিহনে আমিও তেমনি রহিলাম” এই বলিয়া জননী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কাপড় ইত্যাদি ও দুইটী টাকা পথ খরচের জন্য আনিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কাপড়গুলি লইলেন, টাকা লইলেন না। কহিলেন, “মা! টাকা দুইটী লইয়া গেলে আপনার কষ্ট হইবে, আমি পথের খরচ কিছু বৈকুণ্ঠ বাবুর নিকট হইতে লইয়া যাইব। আর সদা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন, বিনোদকে দুই এক মাসের মধ্যে এখানে আনিবেন, শুনিয়াছি তাহার শ্বশুর বাটী বড় কষ্ট হয়। অত করিয়া ভাবিবেন না, আমি অতি সত্বরেই আসিব” এই বলিয়া নরেন্দ্র জননী চরণে প্রণাম করিলেন। জননী কাঁদিতে লাগিলেন—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “নরেন্! তুমিত অন্য দিনও অন্যত্র গমন করিয়া থাক কিন্তু আমার মন ত এমন করে না? আজ যেন মনের ভিতর কি জলিতেছে, প্রাণ যেন হারাই হারাই করিতেছে, জানি না বিধি হতভাগিনীর অদৃষ্টে আবার কি ঘটান। বাপরে! যেখানে যে অবস্থাতেই থাক—সুখেই থাক দুঃখেই থাক—সেই দীননাথের নাম বিস্মরণ হইও না। যে নামের মহিমা-বলে প্রহ্লাদ অগাধ সাগর, ভীষণ অনল, কালকূট গরল, মত্ত-মাতঙ্গ-পদতল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল,—যে নামের গুণে পাষাণ মানবী, নৌকা স্বর্ণ হইয়াছিল, যিনি বনপ্রদেশ বিবিধ সুগন্ধ প্রসূনে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যিনি অত্যুজ্জল গ্রহগণকে শূন্যমার্গে পরিস্থাপন করিয়াছেন, যিনি এক ঋতুর প্রসূননিচয় পরিশুষ্ক হইতে না হইতে ভবিষ্যৎ ঋতুর কুসুমোদ্গমের উপায় বিধান করিয়াছেন, যিনি কাতরের বন্ধু, অনাথের নাথ, অগতির গতি, সেই পরমেশ্বরকে ভুল’না। ঈশ্বর না করুন; যদি কখন বিপদে পড়, তবে সেই সর্ব্বসন্তাপহারী মধুর নামটী যেন তোমার

হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে জলদগম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠে, তাহা হইলে আর তোমার কোন বিপদই থাকিবে না। সেই বিপদ-হারী তোমার সর্ব্ববিপদ হরণ করিবেন।" এই বলিয়া জননী নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র কহিলেন, "মা! তবে এখন আসি?"

জননী। এস, বাপ! একবার যাত্রাকালে বদন ভ'রে বল—সেই মধুমাখা নামটী বল—বল,

"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

বলিয়া নরেন্দ্র শুভ যাত্রা করিলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই চাকরটী চলিল। জননী, একদৃষ্টে যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা গেল, চাহিয়া থাকিলেন। ক্রমে নরেন্দ্র নয়নের বহির্ভূত হইলেন। তখন জননী অঞ্চল দ্বারা বিগলিত নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন—ধন্য মাতৃস্নেহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——০০——

বালিকার প্রেম।

ফাল্গুণ মাসের দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে। রক্তিম সুধাকর বসন্তানিলোচ্ছাসিত বীচিমালোপরি পড়িয়া কেমন সুন্দর কালোয় মিশান সুন্দর রঙ্ ধরিয়াছে! দিবাকর বিরহ-ভয়ে সরসি-বালা নলিনীসুন্দরী ম্লান বদনে ঢলিয়া পড়িতেছে,

আর মল্লিকা পাতার আড় হইতে ধীরে ধীরে তাহার পানে চাহিয়া যেন, সকলেরই ঐ দশা তাই দেখিতেছে। পাদপাগ্র হইতে পাপিয়া সপ্তমে ঝঙ্কার দিতেছে, এবং তাহার দেখা দেখি প্রতিবেশী পক্ষিগণও মধুর কণ্ঠে তান্ ধরিয়াছে। কুলাঙ্গনাগণ যৌবনের মনোমুগ্ধকর মোহিনী ছটা ছড়াইয়া সরোবরে অঙ্গ-নিমজ্জনার্থে গমন করিতেছে, রঙ্গে ভঙ্গে বসন্তের মৃদু অনীল তাহাদের কোমল দেহায়তন পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম বসন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

এই সময় সদরপুরের সদর কাছারী গৃহে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া হরকান্ত রায় রোপ্যনির্ম্মিত আল্‌বোলায় সুগন্ধি তামাকুর ধূম পান করতঃ মর্ত্তে স্বর্গ সুখানুভব করিতেছেন। পার্শ্বে দেওয়ান, মুহুরী, খাজাঞ্চী, চাকর ও দুচার জন তোষামোদী বসিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। এমন সময় নরেন্দ্র-নাথ সেই লোকটীকে সঙ্গে করতঃ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরকান্ত মধুর বাক্যে কহিলেন, "এস নরেন্! ভাল আছ ত?"

নরেন্দ্র ভক্তিভাবে প্রণাম করতঃ কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে শারীরিক একরূপ কুশলে আছি।"

হর। আসিয়াছ—উত্তম হইয়াছে, আমার সে আত্মীয়টী অদ্যই বাটী যাইবেন, তাঁহার সহিত তুমিও গমন করিও, তিনি তোমায় বেশ একটী মোটা মাহিনার চাকরী করিয়া দিবেন। এখন বৈঠকখানায় গমন করতঃ বিশ্রাম লাভ করগে।

নরেন্দ্র। যাই; বৈকুণ্ঠ বাবু কোথায়?

হর। কলিকাতায়।

নরেন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। বৈঠকখানায় গমন করি-লেন। ক্রমে তপনদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। নৈশলীলা-

কাশে দুই একটী করিয়া নক্ষত্র উদিত হইতে লাগিল, আর তাহার মাঝখানে—স্বর্ণ চৌকুলী মাঝে পদ্মরাগ মণির ন্যায় পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছেন, মধুরে উজ্জ্বল মিশিয়াছে; দক্ষিণ বাতাস জ্যোৎস্নাকে আলিঙ্গন করিয়াছে। এইরূপ মধুময় প্রেমের আলিঙ্গন সময়ে একটী ঝি আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিল আপনাকে বাটীর ভিতর ডাকিতেছেন।

"যাই" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর গমন করিলেন। বাটীর মধ্যে গমন করিতেই একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। "নরেন্দ্র আসিয়াছে, নরেন্দ্র আসিয়াছে" ইত্যাকার একটা শব্দ পড়িয়া গেল। নরেন্দ্র শশী-দলের ভাবীপতি ইহা প্রায় মেয়ে মহলে একরূপ ঠিক হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নরেন্দ্র শিশুকাল হইতেই এই বাড়ীতে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, সে জন্য সকলেই নরেন্দ্র-নাথকে ভাল বাসে; সুতরাং নরেন্দ্র আসিয়াছে "দেখিয়া আসি" বলিয়া রাঁধুনী ঠাকুরাণী কড়াইয়ের ঈষদুনোত্তপ্ত তৈলে তরকারি দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার একটা "ছ্যাঁক্, ছ্যাঁক্" শব্দ, যে মেয়েরা বাটনা বাটিতে ছিল তাহারা অর্দ্ধনিষ্পন্ন বাটনা-গুলি সম্পন্ন করিয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে যাইবে বিবেচনায়, বেশী জোরে জোরে বাটনা বাটায় শিল নোড়ায় "ঘটং ঘটং" ধ্বনি, যিনি মৃদু জ্যোতিঃবিশিষ্ট দীপালোকে নিজ অঙ্গের উজ্জ্বল জ্যোতিঃবিকীর্ণ করিয়া পান সাজিতেছিলেন, তিনও হস্তস্থিত কর্ম্ম সমাধানান্তে নরেন্দ্রকে দেখিতে যাইবার মানসে, সুপারী কর্তন-অস্ত্র মধ্যে সুপারী দিয়া তাড়াতাড়ি কাটায় তাঁহার "কচ্ কচ্ কাচ" ইত্যাদি শব্দ হইতেছে। যাঁহারা উহার মধ্যে একটু প্রবীণা রকমের তাঁহারা তত হালকা নহেন; সুতরাং কর্ম্ম সম্পা-

দন জন্য অত ব্যতিব্যস্ত না হইয়া, ইনি উঁহাকে, উনি তাঁহাকে, তিনি অপর একজনকে নরেন্দ্রের আগমন বার্ত্তা দিতেছেন, কেহ বলিতেছেন, "ওগো, নরেন্দ্র এসেছে শুনেছ?" কেহ বলিতেছেন, "কৈ না ত?" কেহ বলিতেছেন, "সত্যি এসেছে নাকি?" কেহ বলিতেছেন, "শুনিয়াছি," কেহ বা নরেন্দ্রোদ্দেশে, স্নেহের পরিচয় দিতেছেন, কেহ বা রসিকতা করিতেছেন, কেহ বা শতদলের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিবাহ কামনা করতঃ হরিরলুট মানিতেছেন, এবং তাঁহাকে দেখিতে যাইবার বন্দোবস্তও করিতেছেন। যে মেয়েরা বসিয়া "বোধোদয়" "চরিতাবলী" পাঠ অভ্যাস করিতেছিল, তাহারাও নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে যাইবে; কিন্তু কেমন পড়িতে জানি তাহা একবার নরেন্দ্রকে শুনাইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং বড় বড় করিয়া ঘন ঘন "আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই" ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে যাইবার উদ্‌যোগ সময়ে, সকলের আসিবার আগে একটী ক্ষুদ্র শরীরা বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকা শতদলের পরিহিত বসন একখানি হরিতবর্ণের সাড়ী, গলে হীরকখচিত সুবর্ণমালা, হস্তে নানাবিধ সুশোভিত সুবর্ণালঙ্কার। বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। মস্তকের কেশরাশি, সুন্দর পা দুখানি চুম্বন করিতে প্রধাবিত প্রায় চরণ ছোঁয় ছোঁয় করিয়া লইয়াছে। ফল শতদল কামিনী কুসুম—কুসুম কুলের শ্রেষ্ঠ কুসুমকলিকা; নব বসন্ত সমাগমে হাস্যময়ী প্রেমরূপ নীহার বিন্দু এখনও স্পর্শ করে নাই; কিন্তু বিকাশকাল বোধ হয় অধিক দূর নাই।

শতদল আসিয়া নরেন্দ্রনাথের বদন প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "নরেন্! তুমি বড় নিষ্ঠুর! এক্ষণ এসেছ, একবার

কি বাটীর মধ্যে এসে আমাদের সহিত দেখা করিতে নাই? আমি যদি লোক না পাঠাইতাম, তবে তুমি আসিতে না?"

নরেন্দ্র শতদলের বদন প্রতি চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, কথার উত্তর দিলেন না, অবশেষে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শতদল ধাঁ করিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথের বাম হস্ত চাপিয়া কহিলেন, "তুমি অমন করিলে কেন?"

নরেন্দ্র শতদলের বচনামৃত পানে ও অঙ্গস্পর্শে যেন কেমন হইয়া ঢোক গিলিয়া, ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "কই, কেমন শতদল? শতদল হস্ত পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে চুপ করিয়া রহিলে কেন?"

নরেন্দ্র। কোন একটা কথাতে।

শত। এখন আমি বুঝেছি। এই তোমাকে নিষ্ঠুর বলেছি, তাই, কেমন?

নরেন্দ্র। না শতদল তা নহে।

শত। তবে কি বল না।

নরেন্দ্র। তোমাকে আর দেখিতে পাইব না তাই।

শত। কেন, আমি কি মরে যাব?

নরেন্দ্র। বালাই!

শত। তবে কি?

নরেন্দ্র। আমি বিদেশে যাইতেছি, আসিয়া হয় ত আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।

শত। আমি কি লুকিয়ে থাকিব?

নরেন্দ্র। তাহা নহে, শতদল! যদি কোন বড় লোকের বাড়ী তোমার বিবাহ হয় তবে ত আর সেখানে গিয়া এমন করিয়া দেখিতে ও কথা কহিতে পারিব না।

শত। আমি ত বিয়ে করিব না।

নরেন্দ্র। তোমার পিতা দিবেন, তুমি কি করিবে?

শত। দাদা দিতে দিবেন না।

নরেন্দ্র। তবে কি বিবাহ হইবেই না!

শত। তা কি জানি? এখন সে কথা যাক্ তুমি কোথায় যাইবে?

নরেন্দ্র। কোথায় যাইব তাহার নিশ্চয় নাই। তোমাদিগের বাটী একটী বাবু আসিয়াছেন, তাঁহারই সহিত যাইব, তিনি আমার একটী চাকরী করিয়া দিবেন। তাই ত বলিতেছিলাম। হয়ত আসিয়া আর এমন করিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে পারিব না।

শত। কেন পারিবে না?

নরেন্দ্র। বলিলাম যে, তোমার বিবাহ—

শত। বিবাহ কথা ছাড় নরেন্!

নরেন্দ্র। কেন?

শত। আমার উহা ভাল লাগে না—এখন এস উপরে যাই।

শতদল বলিলেন, "এস উপরে যাই।" এদিকে একটী ভৃত্য আসিয়া বলিল, "নরেন্ বাবু! আপনি শীঘ্র আসুন, যাঁহার সহিত আপনি যাইবেন, তিনি নৌকায় গিয়াছেন এবং বাবুও সেখানে গিয়াছেন, আমাকে বলিয়া দিলেন, আমাদের সঙ্গে করিয়া ঘাটে লইয়া যাইতে আর বিলম্ব করিবেন না; করিলে বোধ হয় নৌকা খুলিয়া দিবেন।" নরেন্দ্র শশব্যস্তে কহিলেন "চল যাই।"

শতদল ভগ্নোৎসাহে কহিলেন, "এখনই—এই রাত্রেই যাইবেন?"

নরেন্দ্র। কি করিব শতদল!

শত। তবে উপরে যাইবে না?

নরেন্দ্র কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "কেমন করিয়া যাইব?"

শত। বিদেশে না গেলে হয় না?

নরেন্দ্র। না। তবে যাই শতদল?

শতদল কথা কহিতে পারিলেন না, ছিন্ন তার বীণার ন্যায়, সহসা তাঁহার কণ্ঠ-স্বর রুদ্ধ হইল। প্রশান্ত নীলোৎপল সদৃশ চক্ষুতে জল টস্ টস্ করিতে লাগিল। প্রথমে একটী দুইটী বড় জলবিন্দু গণ্ড-স্থলে পড়িল, শীঘ্রই দর বিগলিত ধারে অশ্রুসম্পাত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। নরেন্দ্র আবার বলিলেন, "তবে যাই শতদল।" শতদল অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন "যাইবে?" "হুঁ" বলিয়া নরেন্দ্র ভৃত্য সহ নদীতীরে গমন করতঃ নৌকারোহণ করিলেন, এবং ভৃত্যকে কহিলেন "বৈকুণ্ঠ বাবু বাড়ী আসিলে তাঁহাকে আমার ভালবাসা জানাইয়া বলিও যে, আমি সত্বরেই আসিব" ভৃত্য চলিয়া গেল মাঝিরাও নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা ভৈরবী নদীর জল ভেদ করিয়া কলকল শব্দে পশ্চিমাভিমুখে চলিল।

পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাতে অসময়েই একটী কথা বলিতে হইল। তা কথাটা এমন কিছুই নহে; এতক্ষণ "বৈকুণ্ঠবাবু বৈকুণ্ঠবাবু" আখ্যায়িকা আরম্ভ পর্য্যন্ত শুনিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয় না পাওয়াতে একটু রাগও করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠ, হরকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বৈকুণ্ঠের বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। বৈকুণ্ঠ সুন্দর, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র যুবা। তবে হরকান্ত রায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটু নিন্দা করিয়া দুঃখ প্রকাশও করিয়া থাকেন, যেহেতু বৈকুণ্ঠ কার্য্যে অনেক

অবাধ্য, আমরাও বলি সেটা ভাল নহে। বৈকুণ্ঠ একরূপ সুখী মন্দ নহেন, ধন মান, বিদ্যাবুদ্ধি, মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব সকলই বর্ত্তমান। আরও বিশেষতঃ তাঁহার পরিণীতা পত্নী সরোজিনীর নিঃস্বার্থ প্রণয়ে তাঁহাকে অতিশয় সুখী করিয়াছে। সরোজিনীর বয়স বিংশতি বৎসর। যৌবন হৃদয়ে, শ্রাবণের গঙ্গার মত শারদীয় পৌর্ণমাসীরজনীর জ্যোৎস্নার মত ঢল ঢল করিতেছে। সরোজিনী পতি-প্রেম-বিহারিণী ও রূপেগুণে কামিনীকুলের আদর্শ যুবতী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদর্শন যাতনা।

ভালবাসার অদর্শন কি কষ্টকর! এক দিন এক যুগের ন্যায় বোধ হয়। নরেন্দ্রনাথ সবে মাত্র একদিন হইল বিদেশে গমন করিয়াছেন; কিন্তু শশিকলার নিকট সুদীর্ঘ কাল বলিয়া বোধ হইতেছে। শশিকলা কি সর্ব্বদা নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইতেন? না—তবে ভাবিবার কারণ কি? কারণ অনেক আছে; বাটী থাকিলে ইচ্ছামত দেখিতে পাইতেন—প্রাণ কাঁদিলে—দেখিবার স্পৃহা বলবতী হইলে—সন্ধান দিয়া আনাইয়া দেখিতে পাইতেন। বিশেষতঃ তিনি কোথায় যাইবেন, কি অবস্থায় থাকিবেন, একটু চাকরীর জন্য কত জনেরই তোষামোদ করিতে হইবে, পরিশ্রান্ত হইলে কে সেবা শুশ্রূষা করিবে এতক্ষণ কতদূর গিয়াছেন, কি করিতেছেন, একান্তে বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতেছেন।

ঘন কৃষ্ণ নিবিড় কুঞ্চিত কেশরাশি হইতে দুই একটী কেশ আসিয়া গণ্ডস্থলে পড়িয়াছে, রক্ত রঞ্জিত কপোলে মুক্তা ফলের ন্যায় দুই একবিন্দু স্বেদনীর, যেন আধফোটা পদ্মটার উপর সলিল বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নে-ন্দীবর যুগল অর্দ্ধ নিমিলিত।

মরি! মরি! এ বালিকা বয়সে এ কোমল মানসে এত চিন্তা কেন? বালিকার চিন্তা-রাহুগ্রস্ত বদন প্রতি চাহিলে প্রতীতি হয় এ সংসারে সুখ নাই। আবার বালিকার প্রেমপূর্ণ নিঃস্বার্থ হৃদয় প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় এ জগৎ আনন্দের খনি। যাহা হউক এ সংসারের কিছুই সম্পূর্ণ দুঃখ বা সুখ নহে। সকলেতেই দুঃখ আছে, আবার সকলেতেই সুখ আছে। পূর্ণচন্দ্র মাসে একদিন, সূর্য্য দুর্লক্ষ্যণীয়, নক্ষত্রগণ অগম্য, প্রণয়ে বিচ্ছেদ, স্নেহ আশঙ্কাপরায়ণ, মমতা আত্মাদররত, সৌন্দর্য্য সর্ব্বনাশের কারণ, বিদ্যার সঙ্গেই বাড়ে, মৃত্যু ইচ্ছাধীন নহে, ফলে বিষ, কোরকে কীট, সংসারে পাপ, নারীর কোমল মনে শঠতা। আবার সমুদ্রে দ্বীপ আছে, আকাশে চাঁদ আছে, মেঘে বিদ্যুৎ হয়, অরণ্যে ফুল ফুটে, শীতাপগমে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয়, কাল কোকিল মধুর গীত গায়, সংসারে ভালবাসা আছে, মানব জীবনে বিবাহ আছে, মূর্খতা শান্তিপ্রদ, দারিদ্র্য রোগ হীন, বিচ্ছেদে তন্ময় হই—যে দিকে তাকাই সেইদিকেই তাহাকে দেখি; পৃথিবীও সুখে দুঃখে মাখান। আশাও হতাশা পরিপূর্ণ। আশায় চিন্তা--হতাশায় পীড়া, যাহার আশা আছে, তাহারই হৃদয়ে চিন্তার একাধিপত্য। শতদলের আশা আছে, তাই শত-দলের এত চিন্তা—এই দিবা শেষভাগেও বালিকা হৃদয়ে এত চিন্তা—তপনদেব দিবসের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া নিজালয়ে গমন

করিতেছেন। পাখিগণ প্রাণীগণকে যামিনী আগমনের সম্বাদ দিতে দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে শাখে শাখে আপন আপন কুলায় গমন করিতেছে। পবনদেব অর্দ্ধ বিকসিত প্রসূনরাজি হইতে পরিমলাপহরণ করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছেন। কৃষকগণ গাভীবৃন্দ লইয়া বাটী আসিতেছে শাখী-শাখে বসিয়া কোকিল কোকিলা পঞ্চমস্বরে বিভুগুণ গান করিতেছে—শতদল একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন—শতদল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সরোজিনী হাসিতে হাসিতে গৃহ প্রবেশ করিলেন, এবং শতদলের ভাবনা অবলোকন করিয়া ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন,—

"কেন লো বিধুমুখি! বসি অধোবদনে,
কাঁদিতেছে প্রাণ বুঝি প্রাণধন বিহনে?"

শতদল চাহিয়া দেখিয়া কিছু লজ্জিত হইয়া চুপ্ করিয়া রহি-লেন, কথা কহিলেন না। সরোজিনী বলিলেন, "ঠিক গেল হার মান;" শতদল সে কথারও কোন উত্তর করিলেন না। সরোজিনী মনে মনে ভাবিলেন, শতদলের বুঝি অসুখ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শতদল! তোমার কি অসুখ করিয়াছে?

শত। না,—

সরো। তবে অমন করিতেছ কেন? নরেন্দ্র বিদেশ গিয়াছেন তাই? ধন্যি মেয়ে! বিদেশ কি কেউ আর যায় না? ইহারি মধ্যে এত, না জানি পরে আরও কি করিবে।

শত। বিদেশ গিয়াছেন বলে কে ভাবিতেছে?

সরো। তবে কেন ভাবিতেছ বল না শতদল?

শতদল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, যখন নরেন্দ্র বিদেশ গমন করেন তখন আমাকে বলিলেন—"শতদল, তুমি আসিয়া আর

এমন করিয়া তোমার সহিত কথা কহিতে পারিব না," আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন ?" তিনি বলিলেন "যদি কোন বড়লোকের বাড়ী তোমার বে হয়, তবে ত সেখানে যাইয়া এমন করিয়া কথা কহিতে পারিব না." তাহার অর্থ এই নরেন্দ্রনাথেরা গরিব কি না— সরোজিনী হাসিতে লাগিলেন; সরোজিনীর এই হাসিতে শতদল লজ্জিতা হইলেন, আর কথাটী কহিলেন না। সরোজিনী বুঝিতে পারিলেন, হাসি সম্বরণ করিয়া কহিলেন "হাঁ, তার পর ?" শতদল কম্পিত ক্রোধের সহিত বলিলেন "আমি তাহা বলিব না।" সরোজিনী শতদলের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আমার মাথার দিব্বি যদি না বল।" শতদল আর অভিমান করিয়া থাকিতে পারিলেন না; মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন— "তাই বাবা যদি বড়লোকের সঙ্গেই বিবাহ দেন, দেখ বো! আমি যদি দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতাম তবে বেশ হইত।"

সরো। কি হইত ?

শত। কিছু না। দাদা কবে বাড়ী আসিবেন বো ?

সরো। কেন, তোমার দাদা এসে কি করিবেন ?

শত। তাহা আমি জানি না।

সরো। তোমার বিবাহ নরেন্দ্রনাথের সহিত দিতে ঠাকুরকে অনুরোধ করিবেন, কেমন ?

শত। না।

সরো। তবে কি করিবেন ?

শত। তোমার শ্রাদ্ধ করিবেন।

সরো। তোমার তাহাতে সুখ ?

শত। কলার খেতে পাব।

সরো। একা খাইলে কি তৃপ্তি বোধ হয়, নরেন্দ্র বাড়ী আসুন ত দুজনে বসে বসে খেও।

শত। দূর!

সরো। ইস্! তাহার জন্য ভেবে ভেবে শীর্ণ হইলেন, আবার দূর!

শত। বৌ! আমি কি তাই ভাবি? আমি যে কি ভাবি, কেন ভাবি তাহা বুঝিতে পারি না; মনে যেন কেমন হয়, যেন পৃথিবীতে নরেন্দ্র আমার সর্ব্বাপেক্ষা আপন—কেন যে আপন ভাবি তাহা বুঝিতে পারি না। নরেন্দ্রনাথকে দেখিলে মনে কেমন এক অনন্তভূত আনন্দ জন্মে, নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিলে যেন সেরূপ কথা পৃথিবীতে আর কাহারও নাই—মন সুধা-সাপ্লুত হয়। আবার না দেখিলে বুকের ভিতর কেমন করে, মনে কেমন ভাবনা আপনা আপনি আসিয়া জুটে, কেন বৌ! এমন হয় কেন?

সরোজিনী স্থিরদৃষ্টে শতদলের বদন প্রতি চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন। কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, দর্পণে প্রতি-বিম্বের ন্যায়, মৃদু নিনাদিনী ক্ষুদ্র বীচিমালিনী জাহ্নবীবক্ষে, পৌর্ণমাসী রজনীতে মৃদুপবন বিকম্পিত শারদ জ্যোৎস্নার ন্যায় শতদল হৃদয়ে নরেন্দ্র যেন প্রতিফলিত হইয়াছে। আরও বুঝি-লেন যে, ইহ জগতে শতদল নরেন্দ্রনাথের, নরেন্দ্রনাথ শতদলের, শতদল উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিল, "কেন বৌ! এমন হয় কেন?"

সরো। তা হয়।

শত। হয় কেন?

সরো। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার জন্য তাহার ঐ রূপই

হয়। এটী ঈশ্বরের নিয়ম। চল শতদল, আজ আমার টবের গাছে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়াছে, তুলিয়া সেইরূপ করিয়া এক ছড়া মালা গাঁথিগে।

শত। চল বৌ! আমার টবের গাছের ফুল ফোটে না কেন?

সরো। ফুল কি আপনি ফোটে?

প্রেম সমীরণ বহিবে যখন
লাগিবে কোরক গায়।
চঞ্চল ভ্রমর বহিয়ে যখন
প্রেম বাতাসের ঘায়॥
প্রাণের ভ্রমর গুনগুরিবে
গুণ গুণ গুণ করে।
অমনি কুসুম ফুটিবে লো সই
কুঞ্জেও থরে থরে।

শতদল হাসিয়া বলিল, দূর! তুমি বড় বেহায়া।

সরো। তোমা হইতে একটুকু ভাল। আমরা আর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ব'সে ব'সে গালে হাত দিয়া ভাবিনে। এই বলিতে বলিতে রমণীদ্বয় সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাশব অত্যাচার।

এক দিন দুই দিন করিয়া দ্বাবিংশতি দিবসে নরেন্দ্রনাথ-দিগের নৌকা ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া পড়িল। নদের প্রবল

তুফান, কিংহসের ক্রীড়া, মকর কুম্ভীর ও বড় বড় মীনের লম্ফ ঝম্ফ ধ্বনি, আর তরণীর অঙ্গে তরঙ্গিণীর ঘাত প্রতিঘাতের চটাং চটাং শব্দোত্থিত হইতেছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আকাশের গায়ে নিশাপতি অথবা নক্ষত্রকুল উদিত হয় নাই। নরেন্দ্র নৌকার সম্মুখে (ছাউনীর মিয়ে নহে) বসিয়া ম্লান বদনে কি চিন্তা করিতেছেন। বোধ হয় শতদলের সেই গর্য্যাঙ্কের পূর্ণ শতদল-বিনিন্দিত বদন ও একাকিনী মাতাকে রাখিয়া দূরদেশে গমন করিতেছেন—কে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে, যদি কোনরূপ অসুখ হয় তবে কে তাঁহাকে এক বিন্দু জল দিবে এই সকলই চিন্তা করিতেছেন। নৌকার মাঝিরা একতানে—

"পার কর ব'লে ডাক্‌ছি কত বেলা"

ইত্যাদি গান গাইতেছে এবং ঝপ্ ঝপ্ করিয়া ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতেছে। নৌকা অবিরাম গতিতে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে দুর্দ্দম্য সময়ের ন্যায় চলিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, আকাশে চাঁদ উঠিল, তীরে বন্য কুসুম ফুটিল, নিকটস্থ বন্দরে দীপালোক জ্বলিল, তথাপিও নৌকার বিরাম নাই। একজন মাঝি নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া কহিল, "বাবু! সম্মুখের এই বন্দর ভিন্ন নিকটে আর বন্দর নাই, আজ্ঞা করেন ত আজ এই খানে নৌকা রাখি। নরেন্দ্রনাথ রামদাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নৌকা কি এইখানে রাখা হইবে।" রামদাস বাবুর সহিতই আসিয়াছেন; সুতরাং রামদাস বাবুর মতেই কার্য্য হইবে।

রাম। না।

নরেন্দ্র। কেন?

রাম। বাইশ দিন হইল পথে রহিয়াছি, আমার ছুটির দিন আর নাই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইতেছে।

নরেন্দ্র। সম্মুখে যে আর বন্দর নাই।

রাম। তুমি কি শুধু খাইতে আসিয়াছ?

নরেন্দ্র। আজ্ঞা তা নহে, থাকিবার বড় অসুবিধা হইবে, তাই বলিতেছিলাম।

রাম। তাহা একরূপ থাকিলেই হইবে, উন্নতি করিতে হইলেই কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। মাঝি তুমি নৌকা চালাও রাখিবার কোন দরকার নাই।

মাঝি নৌকা বাহিতে লাগিল। নৌকা যেমন চলিতেছিল, তেমনিই চলিতে লাগিল নরেন্দ্রনাথ যেমন ভাবিতেছিলেন, তেমনিই ভাবিতে লাগিল। মাঝিরা যেমন গান গাহিতে গাহিতে ক্ষেপণী বিক্ষেপ করিতেছিল তেমনই করিতে লাগিল। ফুল ফুটিয়া যেমন সৌরভ-ভার বিতরণ করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল। সকলই ঠিক সেই ভাবে রহিয়াছে, কেবল চন্দ্রদেব আকাশে নাই—কিছুই থাকিবে না, সকলই যাইবে; তবে আগে আর পাছে—সপ্তমীর চাঁদ অস্তমিত হইয়াছেন। ক্রমে যামিনী শেষ যামে পদার্পণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত হয়েন নাই; চিন্তা যাহার হৃদয়স্তর ভেদ করিয়াছে তাহার কি নিদ্রা আছে? বিশেষতঃ আমাদের নরেন্দ্র তরলমতি নবযুবক। রামদাস নিদ্রিত ছিলেন, সহসা উঠিয়া কহিলেন সময় কত?

নরেন্দ্র চিন্তায় মগ্ন, শুনিতে পাইলেন না। একজন মাঝি উত্তর করিল, প্রায় রাত্রি শেষ হইয়াছে।

রাম। সম্মুখে দ্বীপটিপ নাই?

মাঝি। আছে—কেন?

রাম। সেইখানে নৌকা রাখিতে হইবে।

মাঝি। ওই ত সম্মুখেই দ্বীপ।

রাম। তবে নৌকা রাখ।

মাঝিরা দ্বীপের নিকট নৌকা রাখিল। রামদাস কর্ণধারের নিকট গিয়া ছোট ছোট করিয়া কি বলিয়া দ্বীপের উপর নামিল, এবং নরেন্দ্রনাথকে সেই স্থানে ডাকিল; নরেন্দ্র কহিলেন, "আর ত বেশী রাত্রি নাই, নৌকায় থাকুন রাত্রি প্রভাতে যাহা হয় করিবেন।

রাম। শুন নরেন্দ্র তুমি বড় অবাধ্য।

নরেন্দ্র আর কথা কহিলেন না, নিম্নে আসিলেন। রামদাস বাবু চাকরকে বলিলেন, আমাদের খাবারগুলি আনিয়া দাও। ভৃত্য আনিয়া দিল। রামদাস ও নরেন্দ্র দুইজনে ভক্ষণ করিলেন, এবং রামদাস কহিলেন "নরেন্দ্র! এই স্থানটী বেশ পরিষ্কার, এই স্থানে এখন নিদ্রা যাওয়া যাউক, প্রভাত হইলে আবার যাইব। আমাদের গ্রাম আর অধিক দূর নাই।" নরেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অমত সত্বেও মত দিতে হইল, নতুবা এখনি মধুর তিরস্কারে তিরস্কৃত হইতে হইবে। রামদাস সেই দ্বীপোপরি বালুকা রাশির উপর একটা মাদুর পাতিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন, এবং নরেন্দ্রকেও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন; নরেন্দ্র শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হউক বা না হউক নিশার শেষে নিদ্রা হইবেই হইবে এটী প্রকৃতির নিয়ম। নরেন্দ্র শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন। রামদাস স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য নিদ্রিত হয় নাই; নরেন্দ্র নিদ্রিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, নিজের জামার পকেট

হইতে একটী বাঁশী বাহির করতঃ তাহাতে ফুঁ দিলেন। কর্ণধার কর্ণ পাতিয়া ছিল, সেও ঐ রূপ একটী বাঁশী বাজাইল। আস্তে আস্তে রামদাস উঠিল, এবং শশব্যস্তে নৌকারোহণ করিল। মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল এবং সকলে মিলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানিতে লাগিল। একে জোর বাতাস, তাহাতে ষোল খানি দাঁড় পড়িতেছে, আবার উজান যাইতে হইতেছে না, তরণী "সোঁ সোঁ" করিয়া ফিরিয়া চলিল। হতভাগ্য নরেন্দ্র, সেই জলবেষ্টিত, জনশূন্য, শঙ্কাপূর্ণ স্থানে নিদ্রিত; হায়! সংসার! এত পাপ, এত নিষ্ঠুরতা, এত কঠিনতা, এত স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্রও তোমাতে পরিপূরিত?

নৃশংস রামদাসের অত্যাচার ও সুকুমারমতি নরেন্দ্রনাথের দুঃখ দেখিয়াই যেন, প্রকৃতি দেবী ম্লান হইলেন; রমণী-হৃদয়-স্নেহ-বিমণ্ডিত, প্রকৃতি দেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন, মুষলধারে অশ্রু সম্পাতরূপ বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। প্রকৃতির মুখে কালিমা দেখিয়া, করাল জলদ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। প্রচণ্ড বায়ু, বন উপবন ভাঙ্গিয়া, সুকুমার কুসুম চরণে বিদলিত করিয়া, ভীমনাদে প্রবাহিত হইল। নদ প্রেম-সঙ্গীত রাখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বিশাল তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইল। নরেন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, রামদাস নিকটে নাই, মাঝিরা কেহ নাই, নৌকাও নাই। এ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ভিজিতেছে, হুম্ হুম্ নাদে নদ গর্জ্জাইতেছে, সাঁই সাঁই শব্দে বায়ু বহিতেছে। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, এ দ্বীপে কি একটী বৃক্ষ আছে যে, তাহার আশ্রয় লইবেন? ক্ষণিক মনের ব্যস্ততায় এ পাশ ও পাশ ছুটিয়া বেড়াইলেন, অবশেষে বসিয়া পড়িয়া দুই জানু মধ্যে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"মা! ওমা! আজ তোমার হতভাগ্য সন্তান জীবন হারাইল। মা! আর ত তোমায় মা বলিয়া ডাকিতে পাইব না, আর ত সে স্নেহ-বিমণ্ডিত কথা শুনিতে পাইব না। পিতঃ! আসিবার সময় যে, আপনাকে দেখিয়া আসিতে পারি নাই, আর ত দেখা হইল না। শতদল! কোথা রহিলে? আর ত বাড়ী যাওয়া হইল না, আর ত তোমার আধভাঙ্গা আধজড়িত কথা শুনা হইল না; শতদল! জীবন গেল—গেল জীবন—তুমি সুখে থাক, যদি পরলোক থাকে, যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আবার দেখা হইবে। উহু বড় শীত, বড় বৃষ্টি!!!"

নরেন্দ্র অজ্ঞান হইয়া সেই কর্দ্দমময় স্থানে পতিত হইলেন, এবং বিকারী রোগীর ন্যায় কত কি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। "শতদল—কেঁদনা কেঁদনা—আমার কষ্ট নাই—কিছু নাই—তুমি কেঁদনা তুমি কাঁদিলে মা কাঁদিবেন—আমি না না আমার এ জগতে আর কেহ নাই—তুমি—মা—আর বা—বা—বা—আর আছে—আছে আমার অনাথিনী বিনোদিনী আছে—বিনোদ রে—কে তোরে দুটা খেতে দিবে? দিবেন—দিবেন, জীবন দিয়াছেন যিনি তিনিই দিবেন—তবে শতদল! কেঁদনা—কেঁদনা—ঈশ্বর আমার জীবন ধন শতদলে রক্ষা—ক'র রক্ষা—ক'র প্রভু—তোমা বই আর কে রাখিবে প্রভু—শতদল এস—এস—হৃদয়মাণিক হৃদয়ে এস—ভয় কি?—এস সমাজের ভয়?—সমাজে আর ভয় নাই এস—ভারতবাসী কঠিনতা পরিত্যাগ করিয়াছে, এস—ঐ দেখ ভারতবাসী একতার মালা গলায় পরিয়াছে, এস—এস—হৃদয়মাণিক হৃদয়ে এস—বুক জলে গেল—ফেটে গেল—পুড়ে গেল—এস—এস—ভয় নাই—ভারতবাসীর

সে কূট স্বার্থতা আর নাই—ভারতের হিমানী বিদূরিত হইয়াছে—কোকিল গীত গাইতেছে—সুখ-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে—ভাই ভাইয়ের দুঃখে কাঁদিতে শিক্ষা করিয়াছে—এস কণ্ঠরত্ন দরিদ্রের নিধি, হৃদয়মাণিক হৃদয়ে এস—ভারতে আর ভয় নাই—ভারতে আর বৈষম্য নাই—এস—এস—ভারত এখন স্বর্গ—এস—স্বর্গে কি দুঃখ আছে—এস—এস। এইরূপে আরও কত কি বকিতে লাগিলেন।

ক্রমে বৃষ্টি থামিল। প্রকৃতি আবার শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বায়ু আবার মৃদু গতিতে বহিতে লাগিল, ব্রহ্মপুত্রও আবার কল কল রবে প্রেম-সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। সবই আবার মধুময়। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। প্রভাতের তরুণ অরুণ কিরণ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথের কুঞ্চিত ললাটে রবিকরোত্তাপ পতিত হওয়ায় মোহ ভঙ্গ হইল, চমকিয়া উঠিল; দেখিলেন চতুর্দ্দিক জলে থৈ থৈ করিতেছে, তীরস্থ বৃক্ষ তরুণ অরুণ কিরণে স্বর্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ডালে ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে গান করিতেছে। রজনী হইতে এখন বাঁচিবার আশা কতক পরিমাণে হইয়াছে। কিন্তু দ্বীপ হইতে কে উদ্ধার করিবে? ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন। আর একবার ভাবিতেছেন, যাত্রাকালে মা বলিয়া দিয়াছিলেন "যদি কোন বিপদে পড়, তবে সেই মধুর "হরিনাম" ক'র তাহা হইলে তোমার কোন বিপদই থাকিবে না, সেই বিপদহারী তোমার সর্ব্ব বিপদ হরন করিবেন।" কই, হরি! দয়াময় হরি! বড় বিপদ হরি! আজ আমায় উদ্ধার কর, হরি!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—— oo ——

কীর্ত্তি-কথা।

রামদাস সেন নরেন্দ্রনাথকে দ্বীপে রাখিয়া নৌকারোহণে ফিরিয়া আসিবার সময় ঝড় জলে ঠেকিয়া তীরে নৌকা রাখিয়া ছিল ; প্রভাত হইলে নৌকা ছাড়িল, সু বাতাস পাইয়া পাইল ভরে নৌকা তীরবেগে ছুটিল।

রামদাস সেনের কথা অনেক ক্ষণ উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার বিশেষ পরিচয় এ যাবৎ দেওয়া হয় নাই। রামদাস সেন, যশোহর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করে। আমরা শুনিতে পাই, শিশুকাল হইতেই রামদাসের চরিত্র ঐরূপ। জনশ্রুতি আছে দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে রামদাসকে রামদাসের পিতা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিখিতে পাঠান। রামদাস বাহ্যি-ফিরিতে যাইবার কথা বলিয়া পাঠশালা হইতে বহির্গত হইয়া অদূরস্থিত গুরুমহাশয়ের ভগ্ন বাসা-গৃহের বেড়া ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ গুরুমহাশয়ের বহুযত্নসঞ্চিত জোনাভাজা, মটরভাজা ও গুড়ের গাছান হইতে গুড় চুরি করিয়া খাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুমহাশয় এক দিন দেখিতে পাইয়া রামদাসকে যথেষ্ট প্রহার করিলেন। রামদাস বৈরনির্য্যাতনে কৃতসংকল্প হইয়া যখন গুরুমহাশয় রজনীতে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় গৃহে অগ্নি প্রদান করে। পিতৃপুণ্যফলে জানিতে পারিয়া গুরুমহাশয় সে দিন রক্ষা

পান, এবং তদবধি রামদাসকে পাঠশালায় আসিতে নিষেধ করেন। রামদাস পাঠশালায় যাইবার দায়ে অব্যাহতি পাইয়া, পাখির ছানা পাড়িয়া, প্রতিবেশিদিগের বাটীর শসা কাঁকুড় ইত্যাদি চুরি করিয়া বাল্যকাল অতিবাহিত করে। পরে রামদাসের পিতা মাতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে চন্দ্রপুর নিবাসী জনৈক পরদুঃখকাতর লোক, রামদাসকে সঙ্গে করিয়া নিজ চাকরীস্থানে লইয়া গিয়া, কিছু লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া একটু চাকরী দিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য যে, রামদাস সেন নিজ গুণে ৪।৫ মাস পরেই সে কার্য্য হইতে অবসর লাভ করিয়াছিল। তাহার পরে লোকের বাটীতে কার্য্য কর্ম্মোপলক্ষে গমন করতঃ কর্ত্তৃত্বাদি করা, মধ্যে মধ্যে আত্মীয়ের ভাগিনেয়ের বাটী, ভগ্নীপতির পিস্তুত ভ্রাতার সম্বন্ধীর বাটী, মাগাত ভাইয়ের মামার শ্বশুরের বাটী, মাস্তুত ভগ্নীপতির ভগ্নীপতির পুল্লতাতের জামাই বাটী, পাড়ার হরিবাবুর বোনের ছেলের শ্বশুরের সম্বন্ধীর জামাতার ভগ্নীপতির বাটী বেড়াইত। আর মধ্যে মধ্যে লোক দেখা হইত—"গরুর কুটুম চাটিলে চুঁটিলে, মানুষের কুটুম এলে গেলে!"

এইরূপ করিয়া প্রায় চল্লিশ বর্ষ পার করিয়াছে, অদ্যাপিও বিবাহ হয় নাই, হইবারও আশা নাই। দুই মাস হইল (নরেন্দ্র নাথের কাল স্বরূপ হইয়া) চাকরীর উমেদারীতে সদরপুর আসিয়াছে; হইবারও সম্ভব। অদ্য যে কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে, বুঝি হরকান্ত রায়ের অন্য কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইত কি না, সন্দেহ। সুতরাং রামদাস হরকান্ত রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইবে এবং আশাতিরিক্ত (মোছাহেবী) কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে সংশয় নাই।

যাহা হউক তাহার পর দিন রাত্রি সমভাবে চলায় ত্রয়োদশ দিবসে নৌকা ইচ্ছামতী নদীতে আসিয়া পড়িল। ইচ্ছামতী নদী হইতেই ভৈরবী নদী বহির্গত হইয়াছে। যে স্থানে রামদাস সেনের নৌকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই স্থান হইতে নৌকায় সদরপুর যাইতে হইলে আরও দুই দিবস লাগে। আর সেই স্থান হইতে স্থলপথে গমন করিলে সবেমাত্র সদরপুর এক বেলার পথ। ইচ্ছামতীর ধারে, নবীনপুর গ্রাম। নবীনপুর হরকান্ত রায়ের জমীদারী; এখানে একটী কাছারী আছে—কাছারীতে একজন গোমস্তা, দুই জন পাইক ও একটী মুহরী আছে। রামদাস মাঝি দিগকে নৌকা লইয়া সদরপুর যাইতে আদেশ করিয়া, স্থলপথে যাইবার জন্য তীরে উঠিল, এবং কাছারীতে গমন করতঃ মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিয়া গোমস্তাকে কহিল, "আপনার ঘোড়াটী দিতে হইবে, আমি সদরপুর যাইব, বলবৎ কার্য্য আছে।"

এখন গোমস্তাজী ঘোড়াটাকে বড়ই ভাল বাসেন, তাহার সেবা ভিন্ন প্রায়ই তাহাতে আরোহণ করেন না, অন্যকে দেওয়া ত দূরস্থ। কিন্তু সেদিন, সদরপুর যাইয়া গোমস্তাজী দেখিয়াছিলেন যে, রামদাস, হরকান্ত রায়ের বড় প্রিয় পাত্র, সুতরাং রামদাসকে ঘোড়া না দিলে চাকরী যাইবে। অগত্যা দুঃখিত চিত্তে পাইককে ঘোড়া সাজাইয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন, পাইক ঘোড়া সাজাইয়া দিল। রামদাস অশ্বারোহণ করতঃ সেই দ্বিপ্রহরের খরতর সূর্য্যকর ভেদ করিয়া সদরপুর গমন করিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবীনপুর হইতে সদরপুর একবেলার পথ; কিন্তু নির্দ্দয় রামদাস অশ্বকে উপর্য্যুপরি কশাঘাত করায়, অশ্ব বেগে প্রধাবিত হওয়ায় এক প্রহরের মধ্যেই সদরপুর পৌঁছিল।

দিবা তখন তৃতীয় প্রহর। দিনমণির প্রখর তেজে জগৎ আকুলিত। চৈত্রের নৈদাঘোত্তাপিত পক্ষিগণ বৃক্ষের ঘন বিস্তৃত নবীন পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। গাভিগণ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জল জল করিয়া জলাশয়ান্বেষণে ছুটিতেছে। পবনান্দোলনে প্রতপ্ত বালুকা ও রজঃরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পথিকগণের অসীম যন্ত্রণাপ্রদ হইতেছে, বাবুদের বাগানের আম্র বৃক্ষের ডালে বসিয়া ঘুঘু মৃদু মধুর শ্রুতিসুখদ রব করিতেছে। ঝাউ গাছ শোঁ শোঁ রবে ঘুঘুর কথার প্রত্যুত্তর দিতেছে। ঘুঘু না শুনিয়া আপন মনে "ঘু ঘুঘু" করিতেছে। রসিক পাপিয়া উহাদের ঐ মজা দেখিয়া পিউ পিউ রবে কি বলিতেছে। রামদাস দীন আস্তাবলে অশ্ব রাখিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখে কাছারী গৃহে বাবুরা কেহ এখনও আইসেন নাই। দুই জন যুবক ভৃত্য অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় নিজ নিজ বাটীর কথা, গ্রামের কথা, মুখুয্যে মহাশয়ের কথা, চাটুয্যে মহাশয়ের কথা, পদী ময়রাণীর কথা, ঘোষেদের বাটীর ঝির কথা কহিতেছে এবং তাহাদের রূপ গুণের সমালোচনা করিতেছে। জন কয়ক লোক পোষাকের এক পার্শ্বে বসিয়া ভগ্ন কলিকায় তামাকুর ধূম পান করিতেছে। আর রামধন চোবে দরোয়ান্, একটী থামের আড়ালে বসিয়া দক্ষিণ হস্তের রোপ্য নির্ম্মিত নাতিপষ্টী একবার নাড়িতেছে, পাকা গাত্রমার্জ্জনী খানি এক একবার হাতে করিয়া তুলিতেছে, আবার রাখিতেছে, এবং 'পিলু রাগিণীতে গুণ গুণ করিয়া গীত গাহিতেছে। রামদাস সেলাম ডাকিল, চোবে ঠাকুর! বাবু কোথায়?

চোবে। উপরের ঘরে।

রাম। ডাকিতে পার?

চোরে। না।

রাম। কি পার?

চোরে। কি আর পারি;

রাম। খাইতে?

চোরে। এখন আর বেশী পারি না। একসের চাউল, আধ সের দাউল, আর এক সের আটা পারি বাবু।

"তবে ত আহার নাই বলিলেই হয়" এই বলিয়া রামদাস সেন যে গৃহে হরকান্ত রায় দিবসে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই গৃহে গমন করিল। হরকান্ত রায় পালঙ্কোপরি পয়ঃ-ফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া দেওয়ানজীকে ডাকিতে পাঠাইয়া তৎপ্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে নৈদাঘের ধূম্রাকাশে সহসা জলদোদিতবৎ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সকাশে বৈদ্যবৎ, নিশাগমনকালে পান্থজন সমীপে মেঘোন্মুক্ত শশধরবৎ রণজিগীষু রাজার নিকট অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত সেনানীবৎ রামদাস আসিয়া সমুপস্থিত হইল। রামদাসকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া হরকান্ত রায় কহিলেন, "রামদাস কতক্ষণ? মঙ্গল ত? কোন বিঘ্ন ঘটে নাই ত?" রামদাস, যেন কি একটা সুকীর্ত্তি, বড় একটা বাবুর যশস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া আসিল। গাত্রের জামাটী বার কতক নাড়িয়া গোঁপে তা দিয়া কোঁচার ফুল ঝাড়িয়া ভাব ভঙ্গিতে পথের কষ্ট জানাইয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মঙ্গল। আপনার অনুজ্ঞা পাইলে রামদাস না পারে এমন কার্য্যই নাই।"

হরকান্ত একটু হাসিয়া বলিলেন, "তবে তুমি ত্রেতার রাম-দাস না কি?"

রাম। আপনার নিকট ত বটে।

হর। বিশাল্যকরণী আনিতে পার?

রাম। কালনেমি না থাকিলে পারি।

হর। যুদ্ধের ভয়টা বড় বুঝি?

রাম। না তা নয়, মায়াবী কি না?

হর। যাক্ বাজে কথায় কায নাই, আসল কথার কি? নরেন্দ্রকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?

রাম। এখান হইতে নৌকায় ইচ্ছামতী নদীতে যাইয়া মাঝি দিগকে উত্তরাভিমুখে নৌকা চালাইতে বলিয়া দিলাম, মাঝিরা তদনুসারে নৌকা চালাইতে লাগিল। এক দিন দুই দিন করিয়া পঞ্চদশ দিবসে নৌকা, বঙ্গরাজ্যের ঈশান কোণে আসাম প্রদেশে পৌঁছিল। এখানে ব্রহ্মপুত্র নদ। ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া নৌকা গারঘণ্ড নামক নগরে পৌঁছিল। গারঘণ্ড হইতেও তিন দিবস যাইয়া দ্বাবিংশ দিবসের শেষ যামিনীতে নরেন্দ্রকে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে রাখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি।

হর। শুনিয়াছি ব্রহ্মপুত্র নদের এক একটা দ্বীপ খুব বড় বড় তাহাতে বৃক্ষলতাদি জন্মিয়া থাকে, এবং বৃহৎ বৃহৎ অজাগর সর্প ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বসতি করে। নরেন্দ্রের প্রাণের হানি হইবে না ত?

রাম। আজ্ঞা না, সে দ্বীপটা তত বড় নহে, অতি সামান্য দ্বীপ, তাহাতে একটাও বৃক্ষাদি নাই।

এমন সময় নাগরা জুতা পায় দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া দেওয়ান জী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামদাসকে দেখিয়া বলিলেন, "কখন এলেন? মঙ্গল ত?"

রাম। এই আসিতেছি, এখনও পা ধুই নাই, সকলই মঙ্গল।

দেওয়ান। যে কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?

রাম। সেই কথাই হইতেছে।

হর। হাঁ, যখন নরেন্দ্রকে দ্বীপে রাখ, তখন নরেন্দ্র কিছু বলিয়াছিল ?

রাম। বলিবার কি আর যো রাখিয়াছিলাম, আমি দ্বীপে নামিয়া শয্যা পাতিয়া নরেন্দ্রকে ডাকিয়া শয়ন করিতে আদেশ করিলাম, নরেন্দ্র অনেক আপত্তি করিল, শেষে ধমক দিলাম, কাজেই শয়ন করিল। একে ছেলে মানুষ, তাহাতে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, সুতরাং সেই শীতল স্থানে জলের হিল্লোলে, রজনীর শেষে শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। আমরা নৌকা খুলিয়া চলিয়া আসিলাম। দেখুন বাবু। সুন্দর মুখের কি মহিমা! সুন্দর মুখ কি সর্ব্বত্রই জয়ী ? আমার হৃদয় পর্য্যন্ত সুন্দর মুখের কাছে পরাস্ত হইল! যখন নরেন্দ্রকে দ্বীপে রাখিয়া আসি, তখন তাহার নিকট একটী বাতি জ্বালিয়া থুইয়া আসিয়াছিলাম। শয্যা হইতে উঠিয়া একবার নরেন্দ্রনাথের পানে চাহিলাম, দেখিলাম, ঈষ-দুজ্জ্বলালোক নরেন্দ্রনাথের সুগোল শরীর প্লাবিত করিয়াছে, সুন্দর বদন মণ্ডলের উপর স্বর্ণবর্ণালোক পড়িয়া কেমন এক ভাব ধরিয়াছে। চক্ষুর পাতা দুখানি নিমীলিত। সুবঙ্কিম ভ্রূ-যুগল নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলে উজ্জ্বলতা পরিপূর্ণ। স্মিত মধুর ওষ্ঠাধর ঈষৎ শ্রেণী বিগলিত হওয়ায় কুন্দ বিনিন্দিত দশন শ্রেণী অতীব শোভা বিস্তার করিতেছে। বলিতে কি, দেখিয়া সেই জনশূন্য দ্বীপে সেই অমূল্য মূর্ত্তি রাখিয়া আসিতে প্রাণ কেমন বিচলিত হইল। অন্য লোক হইলে কখনই সে কার্য্য সমাধা করিতে পারিত না; আমি যাই, তাই সম্পন্ন করিয়াছি।

দেওয়ানজি একদৃষ্টে রামদাসের বদন প্রতি চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন। চক্ষুদ্বয় ছলছল করিতেছিল, শেষে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, “কার্য্যটা ভাল হয় নাই।”

হর। কেন প্রাণে ত মরিবে না, আমার ইচ্ছা যে, তাহাকে কিছুদিনের তরে নিরুদ্দেশ করিয়া রাখা। কারণ সে পাষণ্ড দেশে থাকিতে শতদল অন্যকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। বৈকুণ্ঠও অন্য পাত্রের সহিত—শতদলের অনিচ্ছা সত্বে—বিবাহ দিতে দিবে না। সুতরাং কিছুদিনের জন্য নরেন্দ্রকে অন্যত্র রাখিয়া,—এখানে রটাইয়া দিতে হইবে যে, নরেন্দ্র খ্রীষ্টান হইয়া এক সাহেবের সঙ্গে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তার পর কলিকাতার পাত্রের সহিত শতদলের বিবাহ হইয়া গেলে, আবার নরেন্দ্রকে অনুসন্ধান করিয়া আনান যাইবে।

দেওয়ান। অমন শঙ্কাপূর্ণ স্থানে না রাখিয়া কোন একটী লোকালয়ের নিকট রাখিয়া আসিলেই ভাল হইত। নরেন্দ্র ত কখনও দূরদেশে গমন করে নাই, সুতরাং সেইখান হইতে আসিতে আসিতে এদিকে শতদলের বিবাহ হইয়া যাইত। এ যেরূপ স্থানে রাখা হইয়াছে, তাহাতে প্রাণে বাঁচিবার সম্ভব বড় নাই। আহা! তাহার আর সহোদর নাই, তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা ও একটী বিধবা ভগ্নী, কে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিবে?

হর। না হে না, মরিবে না। কেমন রামদাস?

রাম। বোধ হয়, না।

দেওয়ান। যদিই বাঁচে, আর যদিই ঈশ্বরানুকম্পায় দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে, ও কথাটী

রটাইবেন না। তাহা হইলে গরীব বেচারী সমাজচ্যুত হইবে, আর ইহজন্মে বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইতে পারিবে না!

হর। তুমি ত দেখিতেছি বড়ই বোকা, দেওয়ানীগিরি কর কেমন করিয়া? খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে না রটাইলে যদি কোন সুযোগে শতদলের বিবাহ না হইতেই দেশে আসিয়া পড়ে, তবেই মহাগোলযোগ!

দেওয়ান। না তা বলিতেছি না, তবে কি না গরিবের জাতিটা গেলে আর সমাজে স্থান পাইবে না। হিন্দু সমাজ বড়ই কঠিন।

হর। কে বলিল হিন্দুসমাজ কঠিন? তবে তুমি হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক গতি কিছুই অবগত নহ। টাকায় না হইতে পারে হিন্দুসমাজে এমন কার্য্যই নাই। যে সমাজের অর্থপিপাসু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ত্তা, সে সমাজ কঠিন, ইহা তুমি কিসে অবগত হইলে? দুই চারি শত টাকা খরচ করিয়া, দশ পাঁচ জন তর্কবাগীশ, চূড়ামণি, শিরোমণি আনাইয়া এক পেঁতে লিখিয়া লইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। তুমি সে জন্য ব্যস্ত হইও না। সে টাকাটা না হয় আমিই দিব।

দেওয়ান। টাকা দিলেই কি তাঁহারা অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিবেন?

হর। রাম রাম! বড় জ্বালাতনটাই কল্লে হে, টাকা দিয়া যদি তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বল যে, আমি সভার মধ্যে বসিয়া সুরাপান করিব, তখনই এক পেঁতে দিবেন যে, উহা বড়লোকের করিতে আছে। তুমি সেজন্য চিন্তা করিও না আমি নিশ্চয় জানি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত টাকার জন্য সব করিতে পারে।

"তবে এখন কার্য্য কর্ম্মাদি দেখিগে" বলিয়া দেওয়ানজী সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং খাচাঞ্চী, মুহুরী ও অন্যান্য চাকর লইয়া সে দিবসের কার্য্য সমাহিত করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল দেওয়ানজী গৃহে গমন করিলেন। দেওয়ানজীর নাম, কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি বরিশাল জেলার লোক, এক্ষণে সদরপুরে চাকুরী করায়, এইখানেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারাদি লইয়া আছেন। বাবুদের বাটীর নিকটই ইঁহার বাটী। কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটী পুত্র, দুইটী কন্যা। পুত্রটীর বয়ঃক্রম প্রায় ১৮।১৯ বর্ষ হইবে। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর বয়স পঞ্চদশবর্ষ, নাম চারুশীলা; চারুশীলা শতদলের সই। ছোটটীর বয়স সাত বৎসর। কমলকৃষ্ণের গৃহিণী, মোটা সোটা গাঁটাগোটা গোছের লোক। কমলকৃষ্ণ গৃহিণীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, মনের কথা প্রায় গৃহিণীর নিকট না বলিয়া থাকিতে পারেন না। ইহাতে দোষ হয় কি গুণ হয় তাহা লেখক নিজে অবগত নহে, সুতরাং সমালোচনায় অক্ষম। তবে পাঠক মহাশয় নিজ বুদ্ধিতে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন, "———অন্তরের কথা কভু নারীকে না বলিবে" এই এই অপূর্ব্ব নৈতিক বাক্যের অনুসরণ করিবেন, আর না হয় প্রেমশয্যায় প্রেমপুত্তলীর পার্শ্বে শয়ন করতঃ আস্তে আস্তে অন্তরান্তরোদ্ঘাটন করিয়া অন্তরের অন্তস্তরে যাহা নিহিত আছে তাহা পর্য্যন্ত দেখাইয়া যতগুলি কথা আছে শুনাইবেন, আর এক একবার গৃহস্থিত প্রদীপালোকে, সেই ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি, অথচ সেই কথা শুনিবার জন্য সোৎসুক, আর কথার মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন, মধ্যে মধ্যে অকারণ হাস্য, অকারণ দুঃখ, আর এক একবার স্পর্শসুখ লাভ করতঃ সেই অঙ্গের আনন্দচর্ব্বীর লাবণ্য,

হিল্লোলে ডুবিয়া যাইবেন। ফলতঃ যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লেখক ইহার—এ ভাল মন্দ বিচারের——কোন ধার ধারে না। এখন লেখকের অদৃষ্টের অথবা মতের সহিত কিছু দেওয়ানজীর কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং দেওয়ানজী গৃহিণীকে নিভৃতে পাইয়া নরেন্দ্রনাথের কথা সমস্ত বলিলেন, গৃহিণী শ্রবণ করতঃ পুরুষ মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ সমালোচকের ন্যায়, সকলকে জড়িয়ে সড়িয়ে অনেক দোষারোপ করিলেন। উপসংহারে দুই বিন্দু অশ্রুজল পরিত্যাগ করতঃ অবতারণা সমাপ্ত করিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——oo——

কুসুমে কুলিশ-প্রহার।

হরকান্ত রায়ের বাটীর অন্দরমহলের পশ্চাদ্ভাগে একটী ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান; তাহাতে নানাবিধ সুকুমার কুসুমনিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। কুসুম-সৌরভ, সংসার শিক্ষা শূন্য শিশুর পবিত্র মুখে বিশ্বপাতার নামের ন্যায় দশদিক আমোদিত করিতেছে। প্রভাতের মৃদু বাতাসে ঈষদুচ্চ পুষ্প বৃক্ষ গুলি ধীরে ধীরে দুলিতেছে, আর পল্লব রাশি হইতে টস্ টস্ করিয়া নীহার ঝরিতেছে। যেন বৃক্ষগুলি অধুনাতন বঙ্গবাসীর ন্যায় জাতীয় জীবন হারাইয়া অনুতাপানলে দহ্যমান, ও অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছে। প্রভাতের বাল সূর্য্য-রশ্মি বাগানে পড়িয়াছে; তাহাতে উদ্যান—

নবোঢ়া কামিনীর ন্যায় দূরদেশে প্রিয়তমার হস্ত লিখিত প্রেম-লিপি প্রাপ্ত বিরহীর ন্যায়, শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয় আসিবার দিনে বালিকার ন্যায়, বয়ঃ বিগতে বিবাহ-সম্বন্ধ-শ্রুত জনের ন্যায়—হাসিতেছে। দ্বিরেফকুল মধু-গন্ধে আকুল হইয়া গুণগুণ রবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষিগণ পক্ষ বিধুননে শিশির ঝাড়িয়া আহারান্বেষণে দশদিকে ধাবিত হইতেছে।

উদ্যানে শ্রেণীবদ্ধ সারি দেওয়া ইষ্টক পোঁতা, তাহার থাকে থাকে থাকে থাকে অরকেরিয়া রোপিত, মাঝে মাঝে দুই একটী গোলাপ বৃক্ষ। কোনটীতে চারিটী ফুল, কোনটীতে দুইটী ফুল, কোনটীতে বা একটী ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আবার কোনটীতে বা আদৌ ফুটেই নাই। সেই শিশির-স্নাত নানা রঙ্গে রঞ্জিত অরকেরিয়ার থাকের উপর একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, একবার পা দিতেছে, একবার ইষ্টকের সারির উপর উঠিতেছে পুনরায় একটু জোরে লাথি মারিতেছে। চরণ-ভরে যে গুলি বিশ্রেণী হইতেছে, তাহাদিগকে আবার "তোমা-দের বড় লাগিয়াছে?" বলিয়া সোহাগ করিতেছে। অর-কেরিয়া শ্রেণী যেন জীব—যেন ইংরাজ রাজ্যের বাঙ্গালী! কখন বা গোলাপ বৃক্ষ হইতে গোলাপ পুষ্প চয়ন করতঃ কোন-টীর কেশর ছিঁড়িতেছে, কোনটী রগড়াইয়া ফেলিতেছে, কোনটী বা কুন্তলে গুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে দেখিল, অনতি-দূরে গোলাপ গাছে, একটী বড় গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে! অনন্যমনে তাড়াতাড়ি সেই গোলাপটী তুলিতে যাইতে পশ্চাদ্ভাগের গোলাপ বৃক্ষের কণ্টকে অঞ্চল বদ্ধ হইয়া গেল। একবার মুক্ত করিতে আর একদিকে বাঁধিয়া গেল; পুনরায় সে দিকে মুক্ত করিতে করিতে ক্রীড়াশীল দুষ্টপবন গোলাপ

গাছগুলিকে আঁচলের উপর ঠাসিয়া ঠাসিয়া ধরিতে এবং বালিকার অল্প অল্প স্বেদ বিজড়িত অলক দাম চঞ্চল করিয়া মুখের উপর চোকের উপর ফেলিতে লাগিল। বালিকা বিরক্ত হইয়া বলিল, "দূর ছাই! গোলাপ গাছে কাঁটা কেন?"

এমন সময় পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া প্রখর-নয়না, চঞ্চল-হৃদয়া রমণী মৃদুস্বরে বলিল, ঠিক বলেছ সই! গোলাপগাছে কাঁটা কেন!"

বালিকা শতদল আগন্তুকা শতদলের সই চারু। শতদল পশ্চাৎ ফিরিয়া হাসিয়া কহিল, "কৈ সই? ভাল আছ ত?"

চারু। আজ্ঞা হাঁ. আপনি?

শত। যেমন রাখিয়াছেন।

চারু। "যেমন রাখিয়াছেন কাহার কাছে শিখিলে সই?"

শত। সে দিন আমি দাদার ঘরের উপর বেড়াইতেছিলাম দেখি নীচে দিয়ে (বাহিরের সদর পথ) বাবা কোথায় যাইতে-ছেন, আর একজন, কে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিল, বাবা বলিলেন, ভাল আছ ত? সে বলিল "আজ্ঞে যেমন রেখে-ছেন।" তখন সেই কথা শুনিয়া বৌতে আমাতে কত হাসি-লাম, ভাবিলাম সই আসিলে বলিব, কিন্তু এ যাবৎ বলা হয় নাই, আজ বলিলাম।

চারু। বেশ করিলে, এখন কাঁটায় জড়িয়েছ?

শত। আমি কি সাধে জড়িয়েছি?

"সাধ করিয়া কেহই জড়ায় না।" দেখি বলিয়া চারু শত-দলের অঞ্চল কণ্টক হইতে মুক্ত করিয়া দিল। শতদল মৃদু হাসিয়া বলিল "সই! তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে ত?"

চারু। তোমার নিকট আমি কি কোন দিন কোন কথা গোপন করিয়াছি?

শত। করনিত আজিকার কথাটা একটু গুরুতর কি না?

চারু। কি বল দেখি।

শত। বলিব?

চারু। বল।

শত। ওই—না আর বলিব না তুমি রাগ করিবে।

চারু। করি করিব, তুমি এখন বল।

শত। এই—তুমি সয়াকে—ভালবাসনা কেন?

চারু। ইচ্ছা হয় না।

শত। ও মা! সে কি? যাহার হউক তিনি তোমার স্বামী। স্বামী যে চরিত্রের—যে অবস্থার—লোকই হউন, স্ত্রীর ধর্ম্ম, তাঁহাকে কখনই অমান্য করিতে নাই। বিশেষতঃ আমরা হিন্দু রমণী, আমাদের পতিই সর্ব্বস্ব, আমাদের স্বামীই বন্ধু, স্বামীই শিক্ষক, স্বামীই গুরু, স্বামীই দেবতা, স্বামীই পরলোক, স্বামীই ইহলোক, স্বামীই স্বর্গ, স্বামীই সকলের সব, সবের সকল। তা তুমি স্বামীকে ভক্তি কর না?

চারু। ভক্তি কেন করিব না সই? ভক্তি করি, সেবা করি কিন্তু—

শত। কিন্তু কি? ভালবাসিতে পার না বুঝি?

চারু। হাঁ।

শত। তবে তুমি নরকে যাইবে, যম রাজার দূতে তোমাকে মুষলের বাড়ি মারিবে।

চারু। তা মারে মার খাইব। হাত ত নাই। সই! তুমি পাড়ার হরিকে ভাল বাসিবে? হরি বেশ সুন্দর ছেলে, এবার এন্ট্রান্স পাস করিয়াছে।

শতদল দূরে সরিয়া গিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "পোড়ার মুখী অভাগী, তুই মর, এখনি মর্ এখনি মর্। আমি কি তোর মত কুলটা, আমি কি তোর মত পাপিনী? যে পর পুরুষকে ভাল বাসিব? আমার হৃদয় চিরিয়া দেখ, আমার হৃদয়ের প্রত্যেক পরদায় পরদায়, প্রত্যেক তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, প্রত্যেক শিরায় শিরায়, আমার দেহ মাঝে যেখানে যাহা আছে তাহাতেই নরেন্দ্র-মূর্ত্তি প্রতিফলিত। আমি ইহলোকে নরেন্দ্র ভিন্ন জানি না, পরলোকেও নরেন্দ্র ভিন্ন জানি না, নরেন্দ্র আমার সব। তুই যা, আমার বাগান হইতে এখনই বহির্গত হইয়া যা!!"

চারু একদৃষ্টে শতদলের বদন প্রতি চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে ছিলেন। শুনিতে শুনিতে—প্রবল বেগে প্রবহমান চক্ষের জল চক্ষু প্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া মনে মনে বলিলেন, মরি মরি, বিধিরে! এতটুকু বালিকার, এত ভাল বাসার ধনে আজি কোথায় রাখিলে? তুমি না দয়াময়; মিছে কথা, তুমি যদি দয়াময়ই হইবে, তবে কোমল হৃদয়ে এত আঘাত, এত যন্ত্রণা দাও কেন? সুখের প্রভাতে মেঘ উদিত হয় কেন? কুরঙ্গ নয়নে অশ্রু-প্রস্রবণ বহে কেন? পরে অনেক কষ্টে মনের আবেগ সান্ত্বনা করতঃ কহিল, "সই! তুমি রাগ করিও না, আমি তোমার প্রণয়-পরীক্ষার্থে ও কথা বলিয়াছিলাম। বাস্তবিক আমি যেরূপ ধরনে কথা কহিলাম ও রূপ আমার হৃদয়ের গতি নহে। ও সকল মৌখিক, কেবল তোমার হৃদয়ে নরেন্দ্র-মূর্ত্তি কিরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাই পরীক্ষার জন্য। শতদল, অপেক্ষাকৃত নম্র হইয়া বলিলেন, তুমি যে অর্থেই বলিয়া থাক, যখন তুমি উহা মুখে

আনিয়াছ, তখনই তুমি পাপ করিয়াছ, অতএব, তুমি এখান হইতে যাও।

চারু। রহস্য করিতে অথবা পরীক্ষার্থে কোন কথায় বলিলেই কি দোষ হয়?

শতদল আর কোন কথা কহিল না চুপ করিয়া রহিল।

চারু আর থাকিতে পারিলনা, কাঁদিয়া ফেলিল বলিল,"সই, ভেবেছিলাম বুঝি জন্ম সার্থক করিতে পারিব। কিন্তু হত বিধি তাহাতেও বাদ সাধিল।" শতদল সহসা প্রবলবাত্যা বিতাড়িত কমলের মত কাঁপিয়া উঠিল, বলিল "সই! কি হয়েছে?" চারু চকের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "বলিতে প্রাণ আন্ চান্ বুক দপদপ করিতেছে, না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। নরেন্দ্রনাথ তোমার পিতা কর্ত্তৃক জন্মের মত, নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।" শতদল আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না বসিয়া পড়িলেন, অন্তরে বাড়বাগ্নির ন্যায় আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। বন্ধকলি বিনিন্দিত ঠোঁট দুটী থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু, অতি কম্পিত স্বরে বলিলেন, "সই! নরেন্দ্র যে, চাকরী করিতে গমন করিয়াছেন?"

চারু। না তিনি চাকরী করিতে যান নাই, উহা মিথ্যা। তোমার পিতা চাকরির ভাণ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসনার্থে পাঠাইয়া ছিলেন। যাহার সহিত নরেন্দ্র গমন করিয়াছিলেন, সে গত কল্য বৈকালে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শত। তুমি কাহার নিকট শুনিলে?

চারু। কাল বাবা মার নিকট বলিতেছিলেন আমি বাহির হইতে শুনিলাম।

শত। কোথায় রাখিয়া আসিয়াছে, শুনিয়াছ?

চারু। তা মাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, বাবাও বলিলেন না, সুতরাং শুনিতে পাইলাম না। তবে এই মাত্র শুনিলাম যে, সে স্থান অতি ভয়ঙ্কর!

শত। বাবা, নরেন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিলেন কেন?

চারু। নরেন্দ্র দেশে থাকিলে, তুমি কলিকাতার পাত্রকে বিবাহ করিবে না এইজন্য।

"বাবা এত বিজ্ঞ হইয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিলেন না যে, হিন্দুরমণীর নয়নের অন্তর্হিত হইলে স্বামীর সহিত কখনই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় না। সই! তুমি এখন একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। পার ত আর এক সময় এ হতভাগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিও এখন আমি চলিলাম" বলিয়া শতদল আলু থালু বেশে ভগ্ন হৃদয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। চারুশীলাও বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——oo——

প্রেম-পত্র।

শতদল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাড়ির মধ্যে বড় একটা গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে।

বামী, বামী, শামা, কমলা, বিমলা, সরলা, অবলা, যশোদা প্রমোদা, জ্ঞানদা, সুখদা, মোক্ষদা, নিস্তারিণী, সৌদামিনী, কাদম্বিনী, জগত্তারিণী, মনোমোহিনী; শিবভাবিনী, মন্দাকিনী, গিরিবালা, সুরবালা. শৈলবালা, নগবালা, ব্রজবালা, কিরণ-কুমারী, যোহিত কুমারী, শরৎকুমারী, হেমন্তকুমারী, প্রমোদ-

কুমারী, সুকুমারী, বসন্তকুমারী, হরির মা, রামের জ্যেঠি, শ্যামের খুড়ি প্রভৃতি রমণীগণ একটী বৃদ্ধাকে বেষ্টন করিয়া কেহ হাসিতেছে, কেহ টিটকারী দিতেছে, কেহবা দুইটা কথা বলিয়া রাগ মিটাইতেছে। বৃদ্ধা বহুজনের ঠাট্টা তামাসাতে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া শতদলের সরল প্রাণে আঘাত লাগিল। আমরা জানি, যাঁহারা পর-দুঃখে দুঃখিত হয়েন, পরের চোখে জল দেখিলে চোকের জল রাখিতে অক্ষম হয়েন, তাঁহারা নিজের দুঃখশান্তিও পরদুঃখমোচনে যত্নবান্। বালিকা শতদল, বৃদ্ধার ভদবস্থা অবলোকন করিয়া ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "তোমরা কি করিতেছ গা? বুড়ী তোমাদের কি করিয়াছে যে উহার মনে কষ্ট দাও?" শতদলের কথা কয়টি শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিয়া বলিল "দেখ দেখি মা আমার অপরাধ কি? তখন সেই ঠাট্টা তামাসার তরঙ্গ হইতে আর এক রকমের ঢেউ উঠিল। কেহ বলিলেন, "ওগো! তোমরা জান কি? ভিতরে ভিতরে শতদলের উহাতে খুব মত আছে।"

কেহ বলিলেন, "তা থাকিবারইত কথা, আমরা বলিয়েছি কলিকাতার ছেলে ভাল নয়, কিন্তু তাহার বিষয় আশয়ের আশয়ে শতদল তাহাকে কেন না বে করিতে চাহিবে?"

কেহ বলিলেন, "দেখিলে গা? দাসীর কথা, বাসি হ'লে খাটে, আমি আগেই বলেছি যে, যদিও শতদল নরেন্দ্রকে ভাল বাসে, তথাপিও তাহারা গরীব, আর কলিকাতার পাত্রেরা খুব বড়লোক কেন না তাহাকে বে করিতে চাহিবে?"

কেহ বলিলেন, "ছেলে ভাল না হইলে বিষয়ে কি করে? যদি স্ত্রী পুরুষের মন মিল হয়, তবে গাছতলায় থাকিয়া শাক অন্ন খাইয়াই সুখ হয়। কথায়ই আছে, "ঘরে বাহিরে এক মন,

তবে কর কৃষ্ণ ভজন।" কিন্তু শতদলের সেরূপ মন নহে, উহার কলিকাতার পাত্রকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে দেখিতেছি।"

কেহ বলিলেন, "এতদিন যদিও না ছিল, আজিকার গহনার বাক্স দেখিয়া মন হইয়াছে।" এইরূপে রমণীগণের বক্তৃতার স্রোত চলিতে লাগিল, শতদল এই বক্তৃতার স্রোতমধ্যে পড়িয়া———ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ইতিমধ্যে হরকান্ত রায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরকান্তকে দেখিয়া তাঁহাকে সুখী ও নিজে প্রশংসা লাভ করিবার জন্য রমণীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে বলিত শতদল, নরেন্দ্রকে ভাল বাসে এবং কলিকাতার পাত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকার? এই ত স্বীকার আছে।"

হর। কেন স্বীকার হইবে না? ও ত কচি মেয়ে ও আবার বে ফের কি বুঝে? ঐ যে হতভাগা বৈকুণ্ঠ; ঐ সব নষ্টের গোড়া। বেহ্মজ্ঞানী না তার মাথা জ্ঞানী কি হয়েছে, তাহাতে তাহার আত্মপর, ভালমন্দ কিছুই জ্ঞান নাই এত কাণ্ড কারখানার যোগাড় তাহারই।

একটী রমণী। বৈকুণ্ঠ কি বেহ্মজ্ঞানী না কি?

হর। কি জানি বোন্, শুনিয়াছি ত বেহ্মজ্ঞানীরাও ঐরূপ।

রমণী। বৈকুণ্ঠ কি যাহার তাহার ভাত খায়?

হর। না, তা' খায় না; তবে বলে যে, উহাতে কোন পর-মাত্মার হানি হয় না।

রমণী। তবে বোধ হয় গোপনে গোপনে খায়।

হর। না, আমি তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি-য়াছি। সে দিন ও পাড়ার খগেন্দ্র বসুকে বলিয়াছিলাম যে,

তোমার পুত্রের সহিত বৈকুণ্ঠের বেশ ভাব আছে, তোমাদের বাটী নিমন্ত্রণ করিলে ও খায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। সেও বলিল, "সে বিষয় দেখিবার আমারও ইচ্ছা আছে, কারণ ছোড়াগুল ত কেমন একরূপ হইয়াছে, বার জাতির বাড়ি খাইয়া বেড়ায় কি না।" তাহার পর একদিন বৈকুণ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলে আপনি গোপনে আসিয়া একবার আমাদের বাটীতে আহার করিয়া যান তবে বাধিত হই। শুনিলাম তাহাতে বৈকুণ্ঠ বলিয়াছে, তাহা হইলে অধর্ম্ম হইবে। খগেন্দ্র বসুও ছাড়িবার বান্দা নহে। সে বলিল "এই যে, আপনারা বলেন ধর্ম্ম এবং আহার ও পরিচ্ছদে কোন সম্বন্ধ নাই?" তাহাতে বৈকুণ্ঠ উত্তর করিয়াছিল, মহাশয়! "চোরের চুরী করা ধর্ম্ম, যদি সে চুরী না করে তবে তাহার চোরের ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইল না। কিন্তু সে চুরী করিল না বলিয়া ঈশ্বর তাহাকে নির্দ্দয় হয়েন না। আমরা হিন্দু, সুতরাং আমাদের হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইবে। কাজেই আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা ব্রাহ্মণের বাটী আহারাদি করিব ও ব্রাহ্মণের নিয়মাদি প্রতিপালন করিব।" যাহা হউক ফল কথা ছোঁড়াগুলো কি এক রকম "ভুক্তে পশুস্তি বর্ব্বরাঃ" গোছের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সে কথা যাউক, এক্ষণে আমার বৈবাহিকের বাটী (শতদলের ভাবী শ্বশুর বাটী) হইতে কি কি আসিয়াছে, পোর্টমেণ্ট খোল দেখি। রমণীগণ পোর্টমেণ্ট খুলিল এবং গহনা ইত্যাদি বাহির করিয়া দেখিল প্রায় ৪০০০ হাজার টাকার সুবর্ণালঙ্কার ও নানা রূপ খেলেনা। হরকান্ত বড় সন্তুষ্ট হইলেন। বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন পত্র আছে? বুড়ি একখানি পত্র ও এক

খানি বই (কাগজ দিয়া মোড়ান) ও আর একখানি পত্র দিলেন। বইখানিতে ও অপর পত্রখানিতে শতদলের শিরো-নামা। হরকান্ত পুস্তকখানি ও অপর পত্রখানি শতদলের হস্তে দিয়া নিজের পত্র লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। সরো-জিনী ও আর আর জন কতক যুবতী শতদলকে কহিল "ভাই! তোমার হৃদয়েশ তোমায় কি লিখিয়াছেন দেখি," শতদলের হৃদয় কাঁপিল, পুস্তক ও পত্র সরোজিনীর হস্তে প্রদান করি-লেন। সরোজিনী পুস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, পুস্তকের নাম "হায়রে! মজার শনিবার" একটুকু হাসিয়া পত্র-খানি নির্জ্জনে যাইয়া খুলিলেন, তাহাতে লেখা আছে—

পদ্য—

(বহুতর গবেষণাপূর্ণ ও অনেক পুস্তক দেখিয়া শুনিয়া)

শুন ওলো বিধুমুখী প্রেয়সী আমার।
কত যে জ্বলিছে হৃদি বিহনে তোমার॥
এ নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখি কেমনে রব এ চারি প্রহর॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখ সুধাপান॥
কি বলিব প্রাণকান্তে বলিতে সরম পাই।
কিন্তু না-বলিলে আর নিতান্ত উপায় নাই॥
তোমাদনে লয়ে যাবে শয়নে শয়নে!
পারিব রে স, রি, গ, মা, পা, ধা, নি, সা।
স্বরচিত পত্র লেখক, তোমার একান্ত ভৃত্য।

শ্রীভূতেশ্বর বানরজি,

পুঃ—নিবেদন এই যে, প্রেয়সী, তামসী হাসিনী আমার, অবশ্য তুমি ইংরাজী—যাহাতে আমি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া সাহেবদের নিকট চাকরী করিতেছি, তাহা তুমি জান না, ইহাতে আমি তোমার উপর রাগ করি না, যে হেতু তুমি মেয়ে জাতি ইংরাজিতে যাহাকে "উয়োমান্" বলে তুমি তাহাই। তাহাতে আমার নামের পরে যাহাকে বাঙ্গালীরা বন্দপাধাও উপাধি বলে সেই স্থানে "বানরজি" লিখিয়াছি উহার অর্থ বন্দপাধাও!

সরোজিনী পত্র পাঠ করিতে করিতে, মনে মনে বলিলেন বিধিরে! কি করিলে? সিন্দূর মাজ্জিত মুক্তামালা বানরে সমর্পণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ? প্রভো! শতদল নামে সুকুমার কুসুম এ জগতে কি কীট জর্জ্জরিত হইতে সৃজন করিয়াছিলে? এ তোমার কোন্ নামের পরিচয়? পত্র পাঠান্তে সযত্নে হাতে করিয়া নিজ কক্ষে গমন করিলেন। সে রহস্যপূর্ণ পত্র আর কাহাকেও দেখাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

——00——

নূতন দৃশ্য।

আষাঢ় মাস, বেলা দ্বিপ্রহর। কিন্তু দ্বিপ্রহরের খর দিবাকর কর জগৎকে আকুলিত করিতেছে না। আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন, টুপ টুপ করিয়া একটু একটু বৃষ্টি হইতেছে; চপলা সুন্দরী থাকিয়া থাকিয়া পতি-সোহাগে গলিয়া ঢলিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।

আসাম প্রদেশের প্রান্ত সীমায় সরুগাঁও নামে একটী জঙ্গলময় স্থান, তথায় কতকগুলি অসভ্য জাতির আবাস ভূমি। সেই পল্লীর ঈষৎ পশ্চিমভাগে নদীয়া জেলা নিবাসী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক লোক, একটী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া আছেন। ইনি এখানে সরকারী শান্তিরক্ষক পদে নিযুক্ত। ইঁহার সংসারে স্ত্রী ও একটী কন্যামাত্র, আর দুইটী খানসামা ও একটী চাকর। বাড়িখানি খ'ড়ো। চতুষ্পার্শ্বে চাটাইয়ের বেড়া। বাড়িতে চারিখানি গৃহ, একখানি দক্ষিণ পার্শ্বে, তাহাতে কখানি চিত্র টাঙ্গান, ছোট একখানি তক্তাপোষের উপর সতরঞ্চ পাতা, তাহার উপর একখান সাদা ধপ্ ধপে চাদর, বলা বাহুল্য এই গৃহখানি বৈঠকখানার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর তিন খানি ঘর বাড়ীর মধ্যে। বাড়ীর মধ্যে কয়টী আম্র, কাঁঠাল, গুবাক ও নারিকেল প্রভৃতির গাছ রহিয়াছে।

একটু একটু জল পড়িতেছে, একটু একটু বাতাস বহিতেছে, বৃক্ষস্থ পাখীরা নীরবে বসিয়া ভিজিতেছে। অদূরে ডোবার মধ্য হইতে ভেক সমূহ দুই একবার সমস্বরে ডাকিয়া হৃদয়ে শান্তি রস সমুদ্ভূত করিবার চেষ্টা দেখিতেছে।

এমন সময়, একটী যুবক ভিজিতে ভিজিতে বাড়ির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ডাকিলেন "ঝি! আমার কাপড় কোথায়?" ঝি উত্তর দিতে না দিতে, সেই বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন, পশ্চিমের ঘরে তোমার কাপড় রহিয়াছে। যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া একখানি পালঙ্কের উপর অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যুবক পুস্তক পাঠে রত রহিয়াছেন,

এমন সময়, একটী ষোড়শবর্ষীয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী একখানি কাচ নির্ম্মিত পাত্রে কিছু মিষ্টান্ন ও দুইটী ছোট প্রস্তরের বাটীতে একটীতে একটু ক্ষীর ও অপরটীতে একটু মাখন এবং এক গ্লাস জল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। যুবক তাড়াতাড়ি পুস্তক রাখিয়া বলিলেন "তুমি আবার ভিজিতে ভিজিতে কেন আসিলে?"

যুবতী হরিশ্চন্দ্র বাবুর কন্যা। নাম বসন্তকুমারী। বসন্তকুমারীর হৃদয়ে যৌবনের নব-বিভা বিভাসিত; বক্ষঃস্থল সমুন্নত, মধ্যদেশ ক্ষীণ, গ্রীবাদেশ ঈষল্লাল, মুখখানি সরস, দেখিলে যেন বোধ হয় বিধাতার বহুয়াস-সম্ভূত গঠন, বর্ণটী কষিত কাঞ্চন-নিভ। দেহ নাতিক্ষীণ নাতিস্থূল। পরণে একখানি লাল পাছাপেড়ে শাটী—

যুবকের কথার প্রত্যুত্তরে বসন্তকুমারী বলিলেন, "তুমি খাবে না?"

যুবক। আমাকে খাওয়াইতে, তোমার এত যত্ন কেন?

বসন্ত। মা পাঠাইয়া দিল।

যুবক। তোমার মা তোমাকে পাঠাইয়া না দিলে আসিতে না?

বসন্ত। আসিতাম।

যুবক। কেন আসিতে?

বসন্ত। তোমাকে জল খাওয়াইতে।

যুবক। আমি জল না খাইলে তোমার কি কষ্ট হয়?

বসন্ত। হয়।

যুবক। কেন হয়?

বসন্ত। তা' জানি না।

যুবক। তুমি কি আমায় ভাল বাস?

বসন্ত। বাসি বৈ কি।

যুবক। তোমার মা বলিলেন, তোমার সহিত আমার ১৮ই শ্রাবণ বিবাহ হইবে, তুমি স্বীকৃত আছ?

বসন্ত। থাকিব না কেন?

যুবক। তুমি বড় লজ্জাহীনা।

বসন্ত। কেন?

যুবক। রমণীরা কি বিবাহের কথা স্বীকার করে?

বসন্ত। অন্যের কাছে করি না আমি তোমার কাছে করি? তোমার নিকট আমার লজ্জা করে না।

যুবক। তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে?

বসন্ত। যাইব না কেন? তোমার সহিত বিবাহ হ'লে তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই খানে যাইব। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি।

যুবক বলিলেন, বসন্ত আর তুমি আমাকে "ভালবাসি" ও কথা বলিও না। এ পাষণ্ড আর একজনকে এইরূপ ভালবাসা দিয়া শেষে অনেক দুঃখ দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। আ মরি! মরি! সে বালিকার, সে শেষ দেখা সান্ধ্যচ্ছবি আমি অদ্যাপিও ভুলিতে পারি নাই, কভু যে পারিব তাহার আশাও করি না। বীণা ঝঙ্কারের ন্যায়, প্রভাতের সেতার নিস্যন্দিনী ললিত রাগিণীর ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের টোড়ি রাগিণীর ন্যায়, আ মরি! মরি! সে স্বর আজিও আমার কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে। আবার বসন্ত! তুমি আমায় ভাল বাসিছ; বোধ হয়, এ কীট কামিনী-কোরক-মানস কেশর কাটিতেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বসন্ত! তুমি আমায় ভাল বেস না, অনন্ত যাতনা পাবে।

বসন্ত। তুমি যাহাকে ভালবাসিতে তাহার নাম কি?

যুবক। শতদল।

পাঠক বোধ হয় এই স্থলেই বুঝিয়াছেন, যুবক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নির্ব্বাসিত নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথ সেই প্রভাতে দ্বীপোপরি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। সেই সময় হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নৌকারোহণে দেশ হইতে সেই দ্বীপ সন্নিকট দিয়া আসিতেছিলেন. উহাকে বিশেষ বিপদাপন্ন দেখিয়া নৌকা করিয়া বাটী আনিয়াছিলেন। পরে নরেন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সদ্বংশজ জানিয়া নিজ কন্যা বসন্তের সহিত বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া যত্নের সহিত বাটীতে রাখিয়াছেন।

বসন্তকুমারী নরেন্দ্রের নিকট শতদলের কথা শুনিয়া বলিলেন শতদলকে তুমি ভাল বাস?

নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান, ভাবিলেন, হরিশ্চন্দ্র বাবু আমার জীবন দাতা; তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেই হইবে। রমণী হৃদয় ভালবাসার জন্য কাঙ্গাল! প্রেম নাটকে ভাল বাসারূপ দৃশ্য প্রথমাঙ্কে অঙ্কিত, উহার অংশী আর কেহ নয়। শতদলকে ভালবাসি বলিলে, বসন্তকুমারীর মনে দুঃখ হইবে, বলিলেন, আগে বাসিতাম।

বসন্ত। এখন?

নরেন্দ্রনাথ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন,

"জনমবধি ও বদন
হেরিয়াছে এ নয়ন
নাহি চাহে অন্য ধন
ধনী তোমা বই।"

বসন্ত। তুমি বড় কঠিন।

নরেন্দ্র। কেন?

বসন্ত। সে তোমায় ভালবাসে, তুমি তাহাকে ভালবাসনা কেন?

নরেন্দ্র মনে মনে বলিলেন, আমি তাহাকে ভালবাসি কি না, তাহা আমার অন্তরই জানে। (প্রকাশ্যে বলিলেন—)

"তোমার বিধু বদন
হেরিয়া আমার মন
ভুলিয়াছে, প্রাণধন
আমি দোষী নই।"

বসন্তকুমারীর হৃদয় প্রথম প্রেমের আদর জলে গলিয়া গেল, একটু লজ্জা, একটু প্রেম একটু প্রীতি মাখান কথায় বলিলেন, "যা বল ভাই" তোমাকে প্রাণ দিতেও ভয় হয়; আবার কাহাকে দেখিয়া পাছে আমাকেও ভুলিয়া যাও"

নরেন্দ্র।

"তোমারে ভুলিতে কভু নারিব এ জীবনে
জীবন মরণ তুমি চাঁদ হৃদি-গগণে—"

বসন্ত।

"কি জানি ভাই, নানা ছলে
মিষ্ট দু'টী কথা ব'লে
হ'য়ে নূতন তরীর কর্ণধার।

প্রেম সাগরে ভাসিয়ে তরি
দুদিন বেয়ে, ভাঙ্গাতরী—
ফেলে যাবে নূতন তরীর তল্লাসে আবার।"

নরেন্দ্র।

"না বসন্ত! এ জীবনে
ভুলিব না তোমা ধনে
তুমি মম প্রাণের প্রাণ
আজ হ'তে তুমি আমার"

বসন্ত।

"তবে আমি তোমার
সঁপিনু তব পায়ে প্রাণ মন।"

বলিতে বলিতে যেন বসন্তকুমারী—প্রেমরূপ অগ্ন্যুত্তাপে গলিয়া গেলেন। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। পালঙ্কের উপর নরেন্দ্রনাথের নিকট বসিয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রও কি একরূপ হইয়া বাহু দ্বারা বসন্তকুমারীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং সেই সুন্দর বদন বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন, বসন্তের আলুলায়িত কেশরাশি নরেন্দ্র স্কন্ধ-বেষ্টিত হইয়া অতীব শোভা সম্পাদন করিল।

রন্ধন গৃহ হইতে বসন্তের মা ডাকিলেন, "বসন্ত! সত্বর এ ঘরে আসিয়া নরেন্দ্রদিগের আহারের স্থান করিয়া দাও।" বসন্তকুমারী মাতার ডাক শুনিয়া চকিত ভাবে ভাবিলেন, একি! আমি কি পাগল হ'য়েছি! তাড়াতাড়ি পালঙ্কের নীচে নামিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন, "কোথা চলিলে?"

"মা ডাকিতেছেন" বসন্তকুমারী এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বসন্তকুমারী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল; নরেন্দ্রনাথ পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আহারের স্থান হইল, নরেন্দ্রাদি কয়েক জন গমন করিয়া আহার করিলেন। ক্রমে নিবাসগী নিজ পতি ত্রিযাম্পতি সহ স্বস্থানে প্রয়ান করিলেন। যামিনী নব প্রেমানুরাগিনী নব যুবতীর ন্যায় চঞ্চল হৃদয়ে পৃথিবী মাঝে অবতীর্ণ হইয়া সুপ্রেমিক চাঁদের আশে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূরিল না। করাল মেঘ দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। দুঃখে যামিনীর বুক ফাটিতে লাগিল। তাঁহার দুঃখেই যেন জগৎ আঁধার, পর্ব্বত আঁধার, নদী আঁধার, বন, উপবন সকলই আঁধার। দেখিতে দেখিতে যামিনী দ্বিপ্রহর হইল। জগৎ নিস্তব্ধ। সকলেই নিদ্রিত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সর্ণাও সহর বা ভদ্র পল্লী নহে। এখানে কতকগুলি অসভ্য জাতির বসতি এবং এই গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস গৃহাদি। রজনী দ্বিপ্রহর, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ঘোর অন্ধকার। এমন সময় কতকগুলি—আন্দাজ ২৫।২৬ জন ভীমকায় অসভ্য জাতি সশস্ত্রে হরিশ্চন্দ্র বাবুর দরজার নিকট আসিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। সেই হুঙ্কার ধ্বনি গগনমার্গে লীন না হইতে হইতে, তাহার বাটীর ভিতর আসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য

াহারা দস্যু। দস্যুগণ বাটীর ভিতর আসিবামাত্র, সকলেই জানিতে পারিল—কেহবা লাঠি, কেহবা শড়কি, কেহবা ছোরা, কেহবা তরবারি, যে যাহা সম্মুখে পাইল তাহাই লইয়া ছুটিল। এ দিকে পুলিষে সংবাদ যাইবামাত্র পুলিষ আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুগণ সাধ্যমত ক্ষণিক যুদ্ধ করিয়া "রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণপর হইল" তখন সকলে ঘর দ্বার সমস্ত অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কোন দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হয় নাই। বাটীর সকলকে খুঁজিয়া দেখিল সকলেই আছে। কেবল হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খোঁজ নাই, মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক ছুটিল, কোথায়ও তাঁহার উদ্দেশ পাইল না। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, তাঁহাকে দস্যুরা লইয়া গিয়াছে। গৃহিণী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, "এ অভাগিনীর অদৃষ্টে কত কষ্টই না জানি আছে? তুমি এ অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথা গেলে? আর এ পৃথিবীতে তোমার ন্যায় আদর করিয়া কে আমাকে বসন ভূষণাদি দিবে?" বসন্তকুমারীও কাঁদিতে লাগিলেন, "বাবা! এই বনে, আমাদিগকে কাহার করে সমর্পণ করিয়া গেলে? আর কি এ জনমে ফিরিবে না?" নরেন্দ্রনাথও প্রতিপালকের এই অমঙ্গল সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। সকলেই মহাদুঃখিত—মহাশোকান্বিত। রজনী প্রভাত হইল, চারিদিকে লোকজন ছুটিল। একজন সরকারী কর্ম্মচারীর অপমৃত্যুতে বা অপহরণে মহা হুলস্থূল পড়িল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অন্বেষণ পাওয়া গেল না। তখন হরিশ-চন্দ্রের পরিবারবর্গ কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে স্থির করিল, এখানে আর থাকা উচিত নহে। তিন চারি দিন পরে তাঁহারা

স্বদেশ যাত্রা করিলেন, এবং দশ বার দিনের মধ্যেই বাটী পোঁছিলেন। গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসিত হইল, হরিশ্চন্দ্রের এখন শ্রাদ্ধ হইতে পারে কি না? ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন, শ্রাদ্ধটা হইলে কিছু পাওয়া যাইবে। বলিলেন, ওটা কি জান, ওটার মতান্তর আছে। হ'লেও হ'তে পারে, না হলেও হইতে পারে। তবে লেঠাটা মিটাইয়া রাখাই উচিত। তা এখন তোমাদের সময় অতিশয় মন্দ। আর কিছুই করিও না, আমাকে নগদ ৫০টী টাকা দেও, আমি তাহাতেই সকল সারিয়া লইব। পরে আর আর লোকের নিকট জানায় স্থির হইল, অনুদ্দেশ হইলে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাহার শ্রাদ্ধাদি হয় নাই। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। তবে নিতান্তই নিষ্ফল গেল না। কয়েক দিন পরে নরেন্দ্রনাথের সহিত বসন্তকুমারীর শুভ পরিণয় সম্পাদন হইল। তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবশ্যই কিছু লাভ হইল। পাড়াপ্রতিবাসিগণও দুই তিন দিন খুব সন্দেশ, মিঠাই, দই, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাইয়া আনন্দিত হইলেন। বিবাহে সমারোহ বেশ হইয়াছিল; কিন্তু পাঠককে সে সকল কথা বলিয়া আর অধিকক্ষণ ত্যক্ত করিলাম না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—— ** ——

বিষাদ পুতুলি।

পাঠক! চল আমরা একবার শতদলের নিকটে যাই; দেখিগে কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় অভাগিনী কালযাপন করিতেছে।

ঐ দেখ পাঠক! শতদলের, শরৎশশিবিনিন্দিত মুখ খানি ম্লান,. কালিমায় আবৃত। যেমন মুখখানি কালিমাময়; হৃদয় মাঝার তাহা হইতেও কালিমাময়। শতদল কুসুম কলিকায়, যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখন কুটন্ত ফুলটীতে আর সে প্রতিভা নাই। এখন পিতার জেদরূপ কীট হৃদয়-কেশর জর্জ্জরিত করিতেছে, সুখ কাননের চারাগুলি প্রচণ্ড রবির করনিকরে শুকাইয়াছে। যৌবনের সহচর প্রণয়-কোকিল কেবল কলকণ্ঠ বাজাইয়া উঠিতেছিল—সুখের বীণা কেবল প্রভাতে ললিত রাগিণীর আলাপচারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পিতার জেদে—কোকিল নীরব হইয়াছে, সুরভরা বীণার তার ছিঁড়িয়াছে। যদিচ আজিও কলিকাতার পাত্র বা অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই; তথাপি অন্যের সহিত যে বিবাহ হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। কারণ আজ কত দিন বিগত হ'ল, নরেন্দ্রনাথের আর কোন সম্বাদই নাই। হয় ত তিনি আর ইহসংসারে নাই। যদি তিনি এ সংসারে না থাকেন তবে কি অন্যকে বিবাহ করা যাইতে পারে? না—কখনই নহে। যাহাকে প্রাণ সমর্পণ করা হইয়াছে, তাহার অদর্শনে

যদি অন্যকে আবার ভালবাসিতে পারা যায়, তবে আর ভাল বাসার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা কি রহিল? শতদল প্রাসাদের নির্জ্জন গৃহের মেঝের উপর একখানি রঙ্গিন গালিচায় বসিয়া কপোলে কর সংলগ্ন করিয়া এই রূপ নানা বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটী তম্বঙ্গী যুবতী হাসিতে হাসিতে সেই গৃহে প্রবেশ করতঃ যে গালিচার উপর শতদল রহিয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "শতদল! আমি এসেছি।" শতদল ফিরিয়া দেখিলেন, মনোরমা। বলিলেন, "মনু কখন এলে?"

মনো। সন্ধ্যার পর এসেছি। কতকাল পরে দেখা হ'ল।

শত। হাঁ; তুমি প্রায় ৪।৫ বৎসর আইস নাই। বোধ হয় আমাদিগকে ভুলে গিয়াছিলে। তা যেতেই পার, আমা-দিগের হতেও আর একজন ভালবাসার লোক পেয়েছ কি না।

মনো। না ভাই, তা নয়। বাবা আস্‌তে দেন না, বলেন চিরকালই মামার বাড়ী থাক্‌বে।

শত। সতীশ কেমন আছেন, তোমায় কেমন ভালবাসেন?

মনো। ভাল আছেন, ভালও বাসেন ভাল।

শত। কাল আসিবার কথা ছিল, তা এলে না কেন? আমরা তোমার মামাদের বাড়ি তুমি আসিবে বলে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত বসে ছিলেম।

মনো। পরশু আমার সইয়ের বে হ'ল, সে দিন রাত্রি জেগে কাল অসুখ মত হ'ল এবং তাঁহারাও ছাড়িলেন না, তাই কা'ল আস্‌তে পারি নাই।

শত। কতদিন তোমার মধুর কণ্ঠের গান শুনিনি, একটা গাওনা ভাই।

মনো। গাইব? কোন্‌টা গাই বল দেখি?

শত। নূতন দেখে একটা গাও।

মনো। তবে সইয়ের বাসরে গাইব ব'লে যে গানটী বেঁধেছিলাম সেইটা গাই।

মনোরমা কোকিল-কূজিতকণ্ঠে গাইলেন,—

"পলকেতে মজাইলে মন,—
বল কে তুমি পুরুষ-রতন,
আমার মনহরা রতন,
ওহে পাগল করা ধন!
বঁধুরে কি জান ছলা, মজা'তে অবলা বালা,
উদাস হ'ল মন-প্রাণ, হেরি ও বদন
করিলে কি গুণ বল, হরিলে সকল বল,
বিকল হ'ল অঙ্গ সব বেয়াকুল নয়ন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আশার অবসান।

মনোরমা গান সমাপ্ত করিয়া হাসিয়া বলিল, "শতদল, বল ভাই গানটী কেমন?" শতদল বলিলেন, "বেশ, তোমার সইয়ের বিবাহ কোন গাঁয়ে হইল? বরটী কেমন?"

মনো। বরটী বেশ, যেমন সুশ্রী তেমনি মিষ্টভাষী। কোন গাঁয়ে বে হইল, তাহা বলিতে পারি না। সইয়েরা আমার দেশে যখন থাকিত তখনই সেটিকে কোথা পাইয়াছিল।

শত। বামুনের ছেলে ত।

মনো। না মুচি, তোমার বেও একটী মুচির সঙ্গে হইবে। সইয়ের মুচি বরকে যদি তুমি দেখ, তবে তাহাকে তোমারও বে করিতে ইচ্ছা হয়।

শতদল ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি ত আর তোমার মত থুব্‌ড়ি নয়, আমার ত একটী আছেই।"

শত। তোমার সইয়ের বরের নাম কি?

মনো। নরেন্দ্রনাথ।

নামটী শতদলের হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করতঃ রক্তসহ অভ্যন্তরস্থ ধমনী, কৈশিকা শিরা প্রভৃতিতে সঞ্চালিত হইল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "বয়স কত?"

মনো। এই ২২।২৩ বৎসর হইবে।

শতদল অধীরা হইলেন, ক্রমে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত কথাই ঠিক হইল, এ নরেন্দ্র তাঁহার নরেন্দ্র, কিন্তু এখন আর তাঁহার নাই। সে হৃদয়-নিধি—সে ভিখারিণীর রত্ন অন্যে অপহরণ করিয়াছে। আর তাঁহার সে রত্ন পাইবার কোন আশাই নাই। তথাপিও যেমন, কাঁটাবনে কুসুমফুল, প্রবল রোগযন্ত্রণায় আশ্বাস, ঘোরান্ধকারে জোনাকী পোকা; তেমনি যেন তাঁহার হৃদয়ের ভিতর কি একটু হইল। যে টুকু হইল সে টুকু সহজানুমেয়। এত গভীর দুঃখের ভিতরও নরেন্দ্র জীবিত আছেন, তিনি দেশে আসিয়াছেন, আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে আশ্বাস হৃদয়ে অধিকক্ষণ থাকিল না। শতদল স্থির গম্ভীর আবেগ পূর্ণ হৃদয় লইয়া বসিয়া থাকিলেন, কথা কহিলেন না। মনোরমা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "শতদল, চুপ

করে, অমনভাবে রইলে কেন? শতদল ধীরে ধীরে বলিলেন, "মনু, আমার শিরঃপীড়া আছে; তাই বুঝি হইল, আমি বসিতে পারিতেছি না, আমি শুইলাম, তুমি এস শুইবে?"

মনো। না আমি এখন একবার মামাদের বাড়ী যাই।

শত। কাল সকালে আবার এস।

"আসিব বৈ কি" এই কথা বলিয়া মনোরমা চলিয়া গেল। শতদল শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে যামিনী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শতদলের হৃদয়-যাতনারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর শুইয়া থাকিতে সক্ষম হইলেন না, গবাক্ষ সন্নিধানে গমন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে অনিমিষলোচনে, বাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, নীলনভে সুস্নিগ্ধ কৌমুদীমাখা সুধাকর সমুদিত। আশে পাশে ঠেসা ঠেসি মেশা মেশি অগণ্য নক্ষত্রবৃন্দ চাঁদের বদন পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। নিম্নে অর্থাৎ বৃক্ষ শাখায় বসিয়া কোকিল কোকিলা মধুরকণ্ঠ-কূজনে প্রেম মাখা গাথা গাইতেছে। সমীরণ প্রস্ফুটিত ফুলবালার কপোল চুম্বন করিয়া বৃক্ষ বল্লরী দুলাইয়া প্রবহমান। নদী কুল কুল রবে কূলস্থ তৃণলতা সমূহ চুম্বন করিতে করিতে প্রেম সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যেন কোন নষ্ট ধনের অন্বেষণে ছুটিতেছে। তদ্গর্ভস্থ তরণী হইতে একটী নাবিক গাহিয়া উঠিল।

"কাজ কি এ পোড়া প্রাণ সইরে! তার বিহনে"

প্রতিধ্বনি সে ধ্বনি আনিয়া শতদলের কর্ণে ঢালিয়া দিল।

শতদল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পা ছড়াইয়া

টীপিয়া টীপিয়া ভারি কান্নাটাই কাঁদিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্থির করিলেন, "আমি মরিব। আর এ প্রাণে কায কি? নরেন্দ্রনাথ—শতদলনাথ—না না, এখন তিনি আর আমার নাই। না—কেন থাকিবেন না? তিনি আমারই। প্রাণেশ্বর! অভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া অন্য ভাগ্যবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাহাতে সুখী বই দুঃখী নই। তোমার যাহাতে সুখ আমারও তাহাতেই সুখ। কিন্তু হৃদয়-বল্লভ! দাসীকে আপনার করঙ্কবাহিনী করিয়া রাখিবেন। আমি আপনার চিরদাসী—আমি আপনার পদসেবা করিব। আপনার সহধর্ম্মিণীর রাগ ভরেতে না রাখিতে পারেন, আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিব, নরেন্দ্র-সোহাগিনি! আমি নরেন্দ্রের দাসী এখন তোমারও দাসী—আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি তোমাদের পরিচর্য্যা করিব। পায়ে কাঁটা ফুটিলে আমি দাঁত দিয়া তুলিয়া দিব।"

ঝুম্ ঝুম্ করিয়া সরোজিনী শতদলের কক্ষমধ্যে আগমন করিয়া শতদলকে বলিলেন, "শতদল! তোমার দাদা তোমাকে ডাক্‌চেন।"

শতদলের সংজ্ঞা হইল, চমকিত ভাবে অঙ্গচ্যুত বসন ভূষণাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বলিলেন, "তিনি "কোথায়?"

সরোজিনী বুঝিলেন যে, শতদল নীরবে বসিয়া ভারি কান্নাটাই কাঁদিয়াছে। মনে মনে ঈশ্বরকে কত দোষী করিয়া বলিলেন, "তিনি আমার ঘরে। তুমি এস"

"চল যাই" এই কথা বলিয়া শতদল সরোজিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সরোজিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক

খানি চেয়ারের উপর বৈকুণ্ঠবাবু বসিয়া অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতেছেন। শতদল বলিলেন, "দাদা! আমায় কেন ডেকেছ?"

বৈকুণ্ঠ। নরেন্দ্রনাথ দেশে আসিয়াছেন শুনিয়াছ?

শত। হ্যাঁ—মনু ব'ল্লে।

বৈকুণ্ঠ। মনু কে?

শত। মুখুয্যেদের বাড়ীর।

বৈকুণ্ঠ। ওহো! শীতল বাবুর ভাগিনেয়ী? নরেন্দ্রনাথের বে হইয়াছে, শুনিয়াছ?

শত। শুনেছি।

বৈকুণ্ঠ। এখন তুমি কি করিবে?

শতদল লজ্জাবনত বদনে রহিলেন, কথা কহিলেন না। বৈকুণ্ঠ বলিলেন—"অন্যকে বিবাহ করিবে?"

শতদল তথাপিও উত্তর করিলেন না; বৈকুণ্ঠ আবার বলিলেন "তবে এখন আর অন্যকে বিবাহ করিতে আপত্তি নাই!"

সরোজিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া চোক মুখ ঘুরাইয়া বৈকুণ্ঠের বুকে যেন কি হানিয়া মাথা ঢুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "বটে? ও এখন অন্যকে বে করিবে না; আমি একটী করিব।"

বৈকুণ্ঠ সরোজিনীকে চিনিতেন, তাই বলিলেন, "কেন অন্যকে বে করিবে?"

সরো। তুমি বসুদের রঙ্গিনীকে ভাল বাস?

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, "আমি যেমন বসুদের রঙ্গিনীকে ভালবাসি বলিয়া তুমি অন্যকে বে করিবে, নরেন্দ্র কি তেমনি

বসন্তকে ভালবাসে বলিয়া শতদল বে করিবে? কেন নরেন্দ্র কি তাহাকে ভালবাসে না?”

“জানি না তোমাদের পুরুষের হৃদয় কেমন? আমাদের হৃদয় কিন্তু একবার একজনকে দিলে আর অন্যকে ভালবাসে না বা বাসিতে পারে না।”

বৈকুণ্ঠ সস্নেহে কহিলেন, “সকলেরই তাই। কিন্তু শতদলকে যে, নরেন্দ্র অত ভাল বাসিয়াছে, তুমি জানিলে কেমন করিয়া?”

সরো। আমি জানি।

তখন বৈকুণ্ঠ বলিলেন “সরোজিনী, তুমি বুঝিতে পার নাই, এই দেখ, নরেন্দ্র পত্র লিখিয়াছেন।” পত্রে এরূপ লেখা ছিল—

“প্রিয় বৈকুণ্ঠ বাবু!

আমি কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা তোমাকে লেখনী দ্বারা কি জানাইব? সাক্ষাতে সমস্ত কহিব। আমি বসন্তকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। বসন্ত কুমারীকে তুমি জানিতে পার। হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। শতদলের কি বিবাহ হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে কেন হয় নাই? প্রিয়সখী সরোজিনী কেমন আছেন? আমি এখন ভাল আছি; ২২ শে জুন তারিখে বাটী যাইব, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ভরসা করি তুমি কুশলে আছ।

১১ই জুন } একান্ত তোমারই
হতভাগ্য “নরেন্দ্র।”

সরোজিনী ও শতদল পত্র শ্রবণে বড়ই দুঃখিত হইলেন, বুঝি নরেন্দ্র শতদলকে ভুলিয়াছেন। শতদল মনে মনে কত কি

ভাবিলেন; ভাবিলেন, "তিনি ত আমায় ভুলিয়াছেন। আমি কি করিব? কি আর করিব? কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন যাপন করিব—শোকের খরকরে শুকাইয়া মরিব, তথাপিও তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। আশ্রিতা লতা কথনই পাদপ পরিত্যাগ করিতে পারে না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পত্র।

নরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক মালতীনগরে বাটী আসিয়াছেন। কিন্তু আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাটী আসিয়াই শুনিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইয়াছে—সে শোকে কিয়দ্দিবস অভিভূ ছিলেন। তাহার পর হরকান্ত রায়ের অত্যাচার, অদ্যাপিও [illegible] অত্যাচারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। হরকান্ত [illegible] নাথ দেশে আসিবার পূর্ব্বেই সে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া কোথা [illegible] গিয়াছে, ইহা রটাইয়াছিলেন। এখন তাহাতে বি[illegible] দিয়া সমাজ হইতে নরেন্দ্রের নিমন্ত্রণাদি বন্ধ ক[illegible] এতদ্ভিন্ন শতদলের সে মুখখানি অদ্যাপিও হৃদয় হই[illegible] হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? সে নিঃস্বার্থ ভা[illegible] শারদীয় নির্ম্মল গগনের অনন্ত ভাতি সে কি ভুলা [illegible] দল যে, নরেন্দ্র ভিন্ন জানে না, নরেন্দ্র বিহনে সে [illegible] সে সদ্য-বিকসিত রজনীগন্ধটী শুকাইয়া গেল; কিন্তু [illegible] এমনই সুখ-শান্তি-হীন হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছে যে, [illegible]

ভালবাসার প্রতিদানে তাহাকে কিছুই দিতে পারিল ন তিনি অন্যকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া না জানি সে সরলতাময়ী, মধুরতাময়ী, প্রেমময়ী শতদল নিজের ক্ষুদ্র হৃদয় খানির মধ্যে কত যাতনাই সহ্য করিতেছে। নরেন্দ্রনাথ বহি-র্ব্বাটীতে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পিয়ন আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র প্রদান করিয়া গেল। পত্রা-বরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। সে খানি শতদলের লেখা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা দিয়া প্রবল বেগে তাড়িত প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল, হৃদয়ের অভ্যন্তরে কে যেন দুপ্ দাপ্ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল নীরবে ও নিস্তব্ধে থাকিয়া কি চিন্তা করি-লেন, শেষে লেখনী, মসীপাত্র ও কাগজ লইয়া পত্রের প্রত্যু-ত্তর লিখিলেন ; লিখিলেন,—

পত্র।

"এ প্রবল-পাবক বিদগ্ধ-প্রাণ জুড়াইতে—প্রাণাধিকে! তোমা বিহনে আর কে পারে? বহুদিন পরে শ্রীকরকমলাঙ্কিত তোমার প্রেম পরিপূর্ণ স্নেহ মাখা পত্র প্রদান করিয়াছ, তাহা প্রাপ্ত হইয়া বার বার চুম্বন করতঃ ব্যাকুল অন্তরে বিরলে পাঠ করি-লাম। নিদাঘে তাপিত, শোকোচ্ছ্বাসিত প্রবল নিষ্পেষিত, চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় জুড়াইতে—আ—মরি!—মরি!—প্রাণাধিকে! তুমি যে অমৃত সে পত্রে ঢালিয়াছ, তাহা বলিতে সামান্য লেখনী সক্ষম নহে! তাহার প্রত্যেক ছত্রে, প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক অক্ষরে, প্রত্যেক মসীবিন্দুতে যে, কি কবিত্ব-মাধুরী বিন্যাস করিয়াছ, তাহা বুঝিতে পারি না ; অথচ বুঝি যে সেরূপ কবিত্ব পূর্ণ প্রাণ জুড়ান মোহন মন্ত্র, এ জগতে আর নাই। কুমার

প্রাণাধিক

সম্ভব, রঘুবংশ, উত্তররাম-চরিত পড়িয়াছি; হ্যাম্‌লেট, ওথেলো ইলিয়াড পড়িয়াছি; দেবী চৌধুরাণী, বিষ-বৃক্ষ, মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহার, কাদম্বরী, বাসবদত্তা পড়িয়াছি; কিন্তু এরূপ আত্ম-বিস্মৃতি করিতে, এরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা দিয়া প্রবলবেগে তাড়িত প্রবাহ বাহির করিতে, আর কাহাকেও সক্ষম হইতে দেখি নাই। লিখিয়াছ—"প্রাণনাথ! আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না।" আরও লিখিয়াছ,—

তা'র কথা মনে হ'লে শিহরে এখন প্রাণ,
হেরিতে তাহারে সদা, ঝরে মোর দু'নয়ন;
কিন্তু সে ত আর মোরে, রাখে না কভু অন্তরে,
রেখেছে অতি অন্তরে, নাহি দেয় দরশন।
একটুকু দেখা পেলে স্বর্গ পাই করতলে,
সে সুখ হইতে কিন্তু বঞ্চিত হ'য়েছে প্রাণ;
তা'বিনে প্রাণ জ'লে যায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তা'য়,
সে ত আমার সুখে আছে, নাহি সাধ অন্য কোন।
না দিক্ দেখা সে মোরে, মানসে পূজিব তা'রে,
ভাল আছে ভাবিবারে, হ'য়েছে এখন দিন;
সে যাহাতে থাকে ভাল, আমিও তা'য় থাকি ভাল,
সে যে আমার অন্তর ধন, হৃদয় রতন।

আমার হৃদয়ের মাণিক, আমার ভগ্ন-প্রাণ-কুটিরের চাঁদের আলো, আমার যৌবনের সহচরী, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, সংসার সাগরের তরণী, আমার ইহলোকের সর্ব্বস্ব, পরলোকের আশ্রয়, আমার সকলের সব, সবের সকল প্রাণাধিকে! তোমাকে ভুলিব বলিয়া অন্তরে ভাবিয়াছ; কিন্তু হৃদয় সর্ব্বস্ব! তোমাকে ভুলিয়া কি লইয়া সংসারে থাকিব? এ জনমে এ দেহে এক বিন্দু

শোণিত থাকিতে, কখনই তোমাকে ভুলিতে পারিব না। কত দেশ খুঁজিয়াছি, কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি, কত ঘর আলো করা রূপ দেখিয়াছি, কত সোণার সীতা দেখিয়াছি, কত এক মাণিক সাত রাজার ধন দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ছবির ন্যায় এ পাপ সংসারে—এ জনমে, এ পোড়া চক্ষে আর পড়িল না। যদিও তোমাকে দেখিতে পাই না, হৃদয় ফাটিয়া গেলেও দেখিতে পাই না—দেখিতে পাইলেও পোড়া সমাজের দায়ে তাকাইতে পারি না, প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাই না, কথা কহিতে পারি না, হৃদয়ের মর্ম্মভেদী যাতনা জানাইতে পারি না, তথাপিও হৃদয় মাঝারে তব ছবি অঙ্কিত করিয়া সতত তাহার উপাসনা করি, আর উদ্ভ্রান্ত ভাবে গাহি——

মনের বাসনা যদি হ'য়ে মনে মিলাইল,
তবে এ জীবন বৃথা, আর বা কেন রহিল।
এই কি প্রেমের রীত, হ'লো অতি অনুচিত।
তিল সুখ আলাপনে, চির দুখ না ঘুচিল।

প্রাণোপমে! তব বিহনে এ অধমাধম যে, কত কষ্ট সহ্য করিতেছে তাহা জানাইতে ভাষা অক্ষম। কোন কবি নিতান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

"— নয়ন কাতর কেন তাহারে না দেখিলে।
চতুর্ভুজ হ[illegible] বুঝি সে মুখ হেরিলে।
নয়ন [illegible] মত্ত মনেরে আনিলে।
বিনা দরশন তথ, বা[illegible] কি করিলে।
কেমন [illegible], না ভুলে ভুলালে।
কহে আর [illegible] বিনা, সে বিধি নহিলে।"

কিন্তু আমি [illegible] ওটুকু না বলিলেই ভাল হইত। যদি

বলিয়াছেন, দর্শনই দ্রষ্টার সুখ, কিন্তু আমার গুরুদেব কাণা ফুলওয়ালী দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় কবি উহা বলিতেন না—"মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? আমি কি তা'ই হইয়াছি? তা'ও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা। তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কি কোমল? তা নয়। তবে কি? এ কাণাকে বুঝাইবে তবে কি? তোমরা বুঝ না বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন রূপই বুঝ। আমি জানি রূপ দ্রষ্টার মনের বিকার মাত্র, শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন। সেই রূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র। শব্দও শ্রোতার মনের সুখমাত্র।"

* * * আমার মতে———

যত দিন রব ভবে তোমারে মনে ভাবিব।
হৃদয় দর্পণে প্রাণ! তব মুখ নেহারিব।
যত দিন এই ভবে, এ জন জীবিত রবে,
তত দিন প্রাণপ্রিয়ে! তোমারে মনে রাখিব!

হৃদয়ের দেবী তুমি, ভুলিতে কি পারি আমি,
তুমি যদি ভুলরে প্রাণ, আমি তোমায় না ভুলিব।

—যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই মনোদুঃখের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা হউক প্রিয়তমে! এ জনমে তোমায় কখনই ভুলিতে পারিব না। সমাজের কঠিন শাসনে তোমার অশ্রুজল দেখিতে দেখিতে চিতায় যে দিন আরোহণ করিব, সে দিনও তোমায় ভুলিতে পারিব না। প্রাণোপমে! সর্ব্বদা দুঃখ করিও না। সেই ত্রিতাপহারী হরিচরণে মতি রেখো অবশ্যই অনন্ত ধামে (সেখানে এ পোড়া বঙ্গের ন্যায় সামাজিক অত্যাচার নাই) দুই জনে মিলিত হইব।

তোমার চির হতভাগ্য

নরেন্দ্র নাথ।

পত্র লেখা সমাপ্ত হইল। একবার দুইবার তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলেন, পাঠ করিতে করিতে চক্ষু দিয়া গণ্ডস্থলে জলরাশি গড়াইয়া পড়িল। কোঁচার কাপড়ে সে জল মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, শতদল! কেন আমায় ভালবেসেছিলে? আমি তোমার ভালবাসার—নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতিদান কি দিলাম, দিলাম কেবল অনন্ত যাতনা। আ মরি, মরি! সে সান্ধ্য পবন-হিল্লোলিত ফুলটিতে আমি কি প্রহারই করেছি; সে আমার প্রহারে—এ সংসার কাননে না ফুটিতে ফুটিতে বুকের সৌরভ বুকে করিয়া মুস্‌ড়াইয়া গেল। সে কুসুম আর কি ফুটিতে পাইবে না, আর কি সে স্বর্গীয় সুরভিতে এ পাপ স্বার্থপূর্ণ সংসার আমোদিত করিবে না? শেষে পত্রখানি মুড়িয়া লোকদ্বারা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

সাড়া দিল না।

শতদল এখন বড় ক্লিষ্টা, বড় বিষাদিতা, যেন বৈকালের শুষ্ক বেলা, অথবা উন্মূলিত দলিতা লতা গাছটি। নরেন্দ্রের জন্য—পোড়া ভালবাসার জন্য সে উষার বাতাস টুকুতে গঠিত চারু প্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে, দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নলিনী মুদিত হইয়া যাইতেছে। শতদল এখন চুল বাঁধে না, সে চুলের রাশিতে এখন জটা বাঁধিয়া যাইতেছে, এখন কোন গহনা গায়ে দেয়না, কেবল দু'হাতে দু'গাছি সোনার বালা।

বিকালের শেষ বেলা, রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে, তবু বৃক্ষলতার মাথা গুলি চিক্ চিক্ করিতেছে। কাক গুলি বাসায় যাইবার আগে গাছের ডালে, গৃহের ছাদে দল বাঁধিয়া বসিয়া কাকা করিতেছে। বাগানের ভিতর কত রকমের কত ছোট বড় কত পাখী আজকের মত মনের সাধে একবার কিচির মিচির করিয়া লইতেছে। শতদল এই সময়ে খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছে। হাতে সেই নরেন্দ্র প্রেরিত পত্রখানি; ইতিপূর্ব্বে পত্র প্রাপ্তমাত্রেই একবার পাঠ করিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া আবার পুনরায় সেই পঠিত পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন—পাঠ করিতে করিতে চক্ষু দিয়া জল পড়িল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে ভাবিলেন "নরেন্দ্র! প্রাণাধিক! তবে তুমি আজিও আমাকে, এ হতভাগিনীকে ভুল নাই; প্রাণেশ্বর! তুমি ভুলিলে আমার আর কে আছে, তুমি যে আমার উপাস্য দেবতা,

ভবপারের কাণ্ডারী, হৃদয়ের বন্ধু, বিপদের সখা, তোমা বিহনে আমি কাহার মুখ পানে চাহিব ?”

একজন দাসী কাছে আসিয়া বসিল, ব’লিল “তোমার চুল বাঁধিতে মা পাঠাইয়া দিলেন, তোমার চুল বাঁধিয়া দিব।” শতদল বলিলেন, “না আমার চুল বাঁধিতে হইবে না, তুমি যাও সে নাছোড় হইল, শতদল অনেক আপত্তি করিলেন, দাসী ছাড়িল না। শতদল আর কিছু বলিলেন না, সে শতদলের চুলের রাশি লইয়া জটা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল। সরোজিনী আসিয়া নিকটে বসিলেন। শতদল তাঁহার প্রতি চাহিলেন, বলিলেন “বৌ, দাদা ত আজিও বাড়ি এলেন না ”

সরোজিনী। কি জানি ভাই, কোন অসুখ টসুকই বা হ’ল, আমার মন ত বড় অস্থির হইয়াছে।

শতদল। দাদা দু’দিনের জন্য ব’লে গিয়ে আ’জ সতর দিন অতিবাহিত কেন করিলেন ? আমি ত কমলপুরের ঠিকানায় দু’খানি পত্র লিখিলাম একখানিরও উত্তর পাইলাম না। বৌ যে কেমনই কেমন হয়ে উঠিল। এ হতভাগিনীর জন্য তাঁহারও আবার কোন বিপদ ঘটিবে না ত ?

সরোজিনীর হৃদয়মধ্যে এ কথাগুলি প্রবিষ্ট হইয়া সে হৃদয়ে কেমন একরূপ তোলপাড় আরম্ভ করিল; কিন্তু শদতদলের মলিন মুখখানির প্রতি চাহিয়া সে ভাব গোপন করিলেন, বলিলেন “দূর! তা কি হ’তে পারে ?”

শতদল। তবে এলেন না কেন ? তাঁর জন্য আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।

কাহার পায়ের শব্দ হইল, সকলে সেদিকে সচকিতে চাহিল। বাটীর একজন প্রাচীনা দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল; আস্তে

আস্তে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বসিল। সরোজিনী বলিল, "কি ভোলার মা, কি মনে ক'রে ?"

ভোলার মা বলিল "এমন কিছুই নয়।"

সরোজিনী বলিলেন, "তবু।"

ভোলার মা বলিল, "আপনি উঠে এসে শুনুন।"

সরোজিনী। কেন এখানে বলিতে বিশেষ কিছু বাধা আছে না কি ?

ভোলার মা। না এমন কিছুই নয়—শতদলের মে, আজ বিবাহ।

সরোজিনী। (সাশ্চর্য্যে) কাহার সহিত।

ভোলার মা। "কলিকাতার পাত্রের সহিত—তাঁহারা আসিয়া বেলবাজারে আছেন, এ দিকে সব নিমন্ত্রণাদি হইয়া গিয়াছে, লোক জনে বাড়ি পূরিতেছে, কেন আপনারা কি কিছু শুনেন নাই ?"

সরোজিনী ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"না—কৈ আমরা কিছু শুনিতে পাইনি।"

ভোলার মা। তার বিয়ে সে টের পাইনি ?

সরোজিনী। না। বলি এ বাটীর সব আজি বাড়ি আসি-বেন ?

ভোলার মা। কেটা ? দাদা বাবু ?

সরোজিনী। হাঁ !

ভোলার মা। না, আমি যখন বাবুকে পান দিতে গিয়াছিলাম, তখন বাবুকে দেওয়ানজি বলিতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ বাবু বাড়ি আসিবেন না ? তাহাতে বাবু বলিলেন, "আসি-বার যো নাই, এমন কৌশল খাটাইয়াছি যে, এখনও এক

সপ্তাহের কমে কখনও সে আসিতে পারিবে না—সে'ত আর কমলপুরে নাই। সে আসিলে কি এ বিবাহ হইতে দেয়, এমন বানর ছেলে কি মানুষের হয় গা?" শতদলের পাংশুবর্ণ মুখ-মণ্ডল সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল—আবার পরক্ষণেই তাহা আরো পাংশু হইয়া গেল, চোক জলে পূরিয়া আসিল, একবার সরোজিনীর মুখ প্রতি চাহিয়া নত বদন হইলেন। দাসী বলিল, "তা' মা! বাপে যখন বিবাহটা দিতে এত জেদ করিতেছেন, তখন মেয়েমানুষ হ'য়ে কি তোমাদের অমন করা উচিত?"

সরোজিনী। আর অমন করিয়া কি হইবে! ঠাকুর কলে বলে কৌশলে, তাঁকে বিদেশ পাঠিয়ে জোর করিয়া এ কার্য্য করিলেন, হাত কি?

স্নিগ্ধ বিদ্যুতেও বজ্র লুকান থাকে, উষার আলোকেও তাপ নিহিত থাকে। শতদলের স্বভাবতঃ বিনম্র কোমল হৃদয়েও গর্ব্বটুকু লুক্কায়িত ছিল, সে সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "বৌ! বাবা কি জানেন না, এখনও নদী বক্ষে আশ্রয় আছে?" শতদল এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধ করিয়া মাটীর উপর গড়াগড়ি দিয়া—আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল—'দাদা আমায় এ সময় একবার সাড়া দিবে না, না ডাকিতে আপনি আসিয়াছ,—এখন আকুল হইয়া এত ডাকিতেছি একবার দেখিতে আসিবে না দাদা!" রুদ্ধ গৃহে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—কঠোর দেওয়ালের প্রাণও যেন সে আকুল-ক্রন্দনে ফাটিয়া উঠিতে চাহিল, কিন্তু আর কেহ সাড়া দিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

বিবাহ বিভ্রাট।

শতদল চলিয়া গেলেন, প্রাচীনা দাসী অবাক্ হইয়া গেল। সে বলিল, "এমন মেয়েও ত কখন দেখিনি, বিবাহ একজনের সহিত হ'লেই হ'ল। নরেনের কিছু সোণার শরীর নহে, আর কলিকাতার পাত্রেরও কিছু রাঙের শরীর নহে। বিশেষ কলিকাতার পাত্রের রাজার ন্যায় ধন দৌলত আছে—নরেন্দ্রদের কি আছে? দিন কতক খেতেই পেতনা, এখন বিয়ে ক'রে শ্বশুরের কিছু বিষয় পেয়েছে, তাই যেমন-হউক দু'টা ভাতে কামড় দিতেছে।" বুড়ী এইরূপে বক্তৃতা করিতেছে, এ দিকে সন্ধ্যা হইল, ঠাকুর বাড়ী শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—সে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি আকাশ গর্ভে লীন না হইতেই অদূরে ঢোল, কাড়া, সানাইয়ের ঐক্যতান বৈবাহিক-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বুড়ী বলিল, "ঐ বর আস্‌ছে।" সরোজিনী সে বাদ্য শুনিলেন, শুনিয়া ক্ষণিক কি ভাবিলেন, শেষে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, দাসীরাও উঠিয়া গেল।

ক্রমে ছয় দণ্ড রাত্রি হইল, হরকান্ত রায়ের বাড়ি বিবাহের মহাধূম লাগিল। এ উঁহাকে ডাকিতেছে ও উত্তর দিতেছে, তিনি কার্য্যব্যপদেশে ছুটিতেছেন, রাম ভৃত্যের কার্য্যে অতৎপরতা দেখিয়া হিন্দি ঝাড়িতেছেন, শ্যাম লুচির বন্দোবস্ত করিতেছেন, বামুন ঠাকুরেরা খাজা, গজা, লুচি, কচুরী, পানতোয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাশীকৃত করিতেছে, রমণীগণ দল বাঁধিয়া

পান করিতেছে, ছোট ছোট বালক বালিকারা কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ খাদ্য দ্রব্যের সহিত কি সম্বন্ধ তা'ই এক নজরে তাকাইয়া ভাবিতেছে। দেখিতে দেখিতে বর আসিল, মহারোলে বাজনা বাজিল, বরযাত্র ও বর সভাস্থ হইলেন। তখন হরকান্ত বাটীর ভিতর আসিয়া কন্যার বৈবাহিক মান সজ্জা করিতে বলিলেন, পুরস্ত্রীগণ শতদলের গৃহে ছুটিল। হরকান্তের নিষেধ ছিল বলিয়াই এতক্ষণ কেহ সে গৃহে যায় নাই বা তাহারা মানসজ্জা কিছুই করে নাই, এখন অনুজ্ঞা পাইয়া তাহারা ছুটিয়া গেল, আবার অনতিবিলম্বেই, হরকান্ত সেখানে উপস্থিত থাকিতে থাকিতেই ছুটিয়া আসিয়া বলিল "শতদল ত ঘরে নাই।" হরকান্ত সরোজিনীর গৃহে দেখিতে বলিলেন, সেখানেও দেখা হইল না, শতদল তথায়ও যায় নাই। তাহার পর সকলে মিলিয়া বাড়ির সকল ঘরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কোথাও শতদলের সাক্ষাৎ পাইল না। হরকান্ত যে তখন কি অবস্থায় পতিত হইলেন তাহা বর্ণন করা যায় না। বাহিরে গিয়া একথা প্রকাশ করিলেন, চারিদিকে লোক ছুটিল, খানিক পরে ক্রমে ক্রমে সকলে ফিরিয়া আসিল, কেহই শতদলের সাক্ষাৎ পাইল না। হরকান্ত বড় দুঃখিত ও অপ্রতিভ হইলেন। বর মহাশয়ের বহুদিনের আশা ভগ্ন হইয়া গেল। সে জনতা, সে বাদ্যোদ্যম, সে আমোদ আহ্লাদ সবই থামিয়া গেল। সকলেই দুঃখিত সকলেই যেন অপ্রতিভ। পরে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, তখন বর মহাশয় শিশুপালের ন্যায় ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। শতদলের মা, সরোজিনী প্রভৃতি বাড়ির মেয়েরা শতদলের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

নরকান্তের সে দুঃখ, সে রাগ সমস্তই গিয়া গরীব বেচারি নরেন্দ্রের উপর পড়িল—তিনি মনে মনে বলিলেন "বেটাই যত্ত নষ্টের গোড়া।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—**—

বিদায়।

শতদল গৃহের ভিতর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্থির করিলেন, আর এখন সুধু পড়িয়া কাঁদিলে ত চলিবে না। ইহার একটা উপায় করা চাই! কিন্তু কি উপায় করিব, আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া একবার আকাশ পাতাল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, দ্যুলোক ভূলোক সবই চিন্তা করিল, করিয়া কোথাও কিছু উপায় দেখিল না—শেষে ভাবিল মৃত্যু ভিন্ন আর উপায় নাই; এখানে থাকিলে আর দুদণ্ড পরেই তাহাকে জালবদ্ধ হইতে হইবে, তখন শত চেষ্টাতেও আর সে বিপজ্জাল—সে গরল মাখা জাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না? অতএব এখন এখান হইতে দূরে না গেলে আর উপায় নাই, যেখানে জন্মিয়া লালিত পালিত হইয়াছে, যেখানে তাহার জীবনের আশা, বাসনা, স্নেহ, প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে—আবার ঝরিয়া পড়িয়াছে; যেখানে নদীর তরঙ্গে তাহার হৃদয় নাচিয়াছে; ফুলের সঙ্গে প্রাণ ফুটিয়াছে—শিশিরের সঙ্গে অশ্রু ঝরিয়াছে, যেখানকার গাছ পালা, নদী, পুষ্করিণী, পাখী পক্ষী সকলেই তাহার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী, সকলেই তাহার আপনার—শতদল দেখিল—তাহার সেই আপনার স্নেহময়, শত স্মৃতিময় নিবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া না গেলে, আর

উপায় নাই। পীড়িত ক্লান্ত নেত্রে শতদল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—বাড়ির কঠিন দেওয়াল দরজা জানালা গুলা, বাগানের প্রত্যেক গাছের পাতাটি ফুলটি পর্য্যন্ত সে অতৃপ্ত আগ্রহ নয়নে দেখিতে লাগিল, তাহাদের যে সে এত ভালবাসে তাহা শতদল যেন আগে জানিত না। তাহার নয়নের শতধারার মধ্যে বাল্যের ধূলা খেলা, কৈশোরের হর্ষ আশা, যৌবনের অশ্রু নিরাশা, স্মৃতির সহস্র ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়া—শতদলকে বাঁধিবার জন্য চারিদিক্ হইতে তাহাদের স্নেহের শতবাহু প্রসারণ করিয়া দিল, শতদল আর দাঁড়াইল না—তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যাইবার আগে—সরোজিনীর কথা—সরোজিনীর সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সেই আত্মবিমজ্জিনী প্রেমের কথা মনে হইল;—মনে হইল, বড় ইচ্ছাও হইল, যাইবার সময় জন্মের শোধ একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া যাই। কিন্তু সরোজিনী এখন কোথায় আছেন? শতদল এখন তাহার সহিত কোথায় দেখা করিতে যাইবেন, তাঁহার সহিত দেখা করিলে আর কি যাওয়া হইবে, হয় ত কত বাধা জন্মিয়া যাইবে, তাহা হইলে কি হইবে? তবে আর দেখা করিতে যাইব না—সরোজিনীকে অনেক কষ্ট দিয়াছি আর দিতে ইচ্ছা নাই—শতদল আর কাহারও অপেক্ষা করিলেন না, একাকী চলিয়া গেল। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলের বালা একাকী অনাথিনী কেবল অশ্রুজল সাথী করিয়া সংসারের তরঙ্গে আপনার অদৃষ্ট অন্বেষণ করিতে ভাসিয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভিখারিণী।

তাহার পর একদিন একরাত্রি চলিয়া গিয়াছে। আবার প্রভাত হইয়াছে, আবার সূর্য্য উঠিয়াছে—জগতের আঁধার রাশি সরিয়া গিয়াছে, পাখি জাগিয়াছে, মানুষ জাগিয়াছে, জীবজন্তু সবই জাগিয়াছে—সকলেই স্ব স্ব কার্য্যব্যপদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যকরস্পর্শে ঘুমন্ত পৃথিবী হাসি মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে, কেবল দীনবেশা আশ্রয়হীনা অভাগিনী শতদল সমস্ত দিনের পর কা'ল সন্ধ্যা বেলায় যেরূপ শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লান মুখে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে আজিও সেইরূপ ম্লান মুখে সেই খানে বসিয়া আছে—সে মুখে আর হাসির রেখা নাই। শতদলের হৃদয় মধ্যে অগ্নিময় মরুভূমি, সে মরুর জ্বলন্ত বালুকা স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বাসিত হইয়া উচ্চে নীচে দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার চারিদিকে অসীম অপার ধূধূকারী নিরাশা সৃজন করিয়াছে; এ ক্ষুদ্র জীবনে এ অগ্নি সমুদ্র পার হইবার তাহার আর আশা নাই, বুঝি এ সমুদ্রের কূল নাই, কিনারা নাই।

ক্রমে অল্প অল্প রৌদ্র ফুটিল, গাছের পাতার রাশির মধ্য দিয়া একটুকু রোদ আসিয়া শতদলের বিষাদময়ী মুখ খানির উপর পড়িল। শতদল এতক্ষণ পড়িয়াছিল, এখন উঠিয়া বসিল, বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন কোথায় যাই, কোথায় গেলে একটুকু আশ্রয় পাই, গ্রামের মধ্যে যাইতে ভয় হয়, পাছে

কোন নূতন বিপদ ঘটে। কিন্তু লোকালয়ে না গেলেও ত আর উপায় নাই। আজ তিন সন্ধ্যা হইল, তাহার উদরে একটী দানাও পড়ে নাই, কিছু না খাইলে ত আর জীবন থাকিবে না! শতদলের ন্যায় কষ্টকর জীবন না থাকিলে কি কোন ক্ষতি আছে? আছে বৈ কি! আত্মহত্যায় যে মহাপাতক হয়। পূর্ব্ব জন্মে পাপ করিয়া এ জন্মে এতকষ্ট পাইলাম, আবার পাপ করিব—কষ্ট সহ্য না করিলে কি পুণ্য উপার্জ্জন হয়। এক কথায় বলিতে গেলে,—কষ্ট না করিলে সুখ হয় না। কেন দুঃখের জন্য আত্মহত্যা করিব, এ দুঃখ সহ্য করাই ভাল, কিন্তু খাইব কি, থাকিব কোথায়? ভিক্ষা করিব,—ভিক্ষা করিতে হয় কেমন করিয়া তা ত জানি না,—নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে হইবে, হয় ত কত লোকে কত কটু বলিবে, কত উপহাস করিবে, কত মন্দ কথা শুনিতে হইবে—ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল—অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আবার আপনি চুপ করিল—ভাবিল দেখি কতদূর কি হয়, মরণের পথও কঠিন নয়! শেষে ভাবিল এখন গ্রামের মধ্যে যাই, কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিগে, নইলে পাপ উদরে কি দিব। এমন সময় একটী বৈষ্ণবী সেই গাছতলা দিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল, শতদলকে দেখিয়া বলিল, "তুমি কে গা, একলা গাছতলায় বসিয়া আছ?" শতদল শিহরিয়া উঠিল, বলিল "আমি ভিখারিণী।"

বৈষ্ণবী। ভিক্ষা করিতে যাইবে কি?

শতদল। হাঁ ভিক্ষা করিব বৈ কি!

বৈষ্ণবী। আমার সঙ্গে যাবে? এস।

শতদল ভাবিল, এই ঠিক অবসর—উঠি উঠি করিল—অথচ

উঠিতে পারিল না। বৈষ্ণবী বলিল "তবে তুমি যাবে না?" শতদল কথা কহিল না, বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। শতদল ভাবিল আর একজন আসুক—আর দুই জন ভিক্ষুকও সেই পথ দিয়া, ভিক্ষায় গেল—শতদল ভাবিল এইবার উঠি, কিন্তু না, ক্রমে তাহারা দূরে চলিয়া গেল—ক্রমে অদৃশ্য হইল, শতদল ভাবিল, আর একজন আসুক—এইরূপে একজনের পর একজন ভিক্ষায় যাইতে লাগিল, ভিক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল—এক প্রহর কখন চলিয়া গিয়াছে, দ্বিপ্রহরও চলিয়া গেল, শতদল তবুও সেই গাছতলায় তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল এখন না তখন করিয়া বেলা অবসান হইল, একজনও ভিক্ষুক আর পথে দেখা যায় না—দুই এক জন পথিক শতদলের কাছে আসিয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, ভালরূপ উত্তর না পাইয়া চলিয়া গেল, দুই একজন তাহার কাছে গাছতলায় আসিয়া বসিল—শতদল সেখান হইতে উঠিয়া আর একটী নিভৃত বৃক্ষতলায় গিয়া বসিল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "এমন করিয়া আর ক'দিন চলিবে?—যখন ভিক্ষা করিতেই হইবে, তখন আর কিসের সঙ্কোচ—কিসের আর মান অপমান, কিসের এত লজ্জা! এককালে রাজার মেয়ে ছিলাম,—এখন আর তাহাতে কি? এখন ত আর তাহা নই। এককালে স্বর্ণমুষ্টি ছড়াইতে পারিতাম বলিয়া এখন অন্ন ভিক্ষা করিতে লজ্জা করিব? এককালে ফুলের বিছানায় শুইতাম, এখন যে কঠিন মাটিতেও আশ্রয় নাই। চিরদিন কাহার সমান যায়? এককালে যাহা ছিল, এককালে যাহা ছিলাম,—এখন কি আর তাহা আছে? তবে আর কিসের সঙ্কোচ।" শতদল হৃদয়ে এইরূপে বল সংগ্রহ করিতে লাগিল। ক্রমে বিকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিল—এই

সময়ে একদল ভিখারী উত্তর দিকের গ্রামাভিমুখে শতদল যে গাছ তলায় বসিয়া আছে সেইখান দিয়া যাইতে লাগিল। শতদলকে দেখিয়া বলিল, তুমি কে গা, কোথায় যাইবে?” শতদল বলিল “আমি ভিখারিণী।”

তাহারা বলিল “ভিক্ষায় যাইবে কি? যাও ত আমাদের সঙ্গে এস, ঐ যে গ্রাম দেখা যাইতেছে, ওখানকার মদন বাবুর মায়ের মৃত্যু হইয়াছে, আজ শ্রাদ্ধ, তিনি ভিক্ষুকদিগকে দু’আনা করিয়া পয়সা ও চা’ল ডা’ল দিবেন—তুমি যাবে?

শতদল উঠি উঠি করিল—আবার উঠিতে পারিল না, তাহারা বিলম্ব দেখিয়া চলিয়া গেল। শতদল প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর একদল যদি আইসে, নিশ্চয় তাদের সঙ্গে যাইব। দেখিতে দেখিতে আর একদল চলিল। শতদল তাহাদিগকে দেখিবামাত্র প্রাণপণে উঠিয়া দাঁড়াইল—ক্ষুদ্র হৃদয়ে অপরিমিত বল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মলিন চাদর খানি দিয়া নাসিকা চক্ষু ছাড়া আর সকল অঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিল। তার পর ভিক্ষুক যাত্রীদের অনুগামী হইল। অনেকক্ষণ হাঁটিয়া গ্রামের মধ্যে বাবুদের বাড়ীতে ভিক্ষুকগণ জয় হউক বলিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যায় সময় জল খাবার লইতে এক গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল—এক পাত্র খৈ মুড়ী লইয়া একজন মুষ্টি বাঁটিতে লাগিল, সেই এক মুষ্টি খৈ মুড়ীর জন্য এক হাতের উপর দশটা করিয়া হাত পড়িতে লাগিল, একজনকে ঠেলিয়া দশ জন সবলে ভিক্ষাদাতার সম্মুখে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—শতদল সে জনতার মধ্যে দাঁড়াইতে সাহস না করিয়া কিছু দূরে একজন দর্শকের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য সকলে জল খাবার লইয়া চলিয়া গেল—ভিক্ষাদাতা পাত্র ঝাড়িয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

শতদল দেখিল আর পাইবার আশা নাই, নিরাশহৃদয়ে ভিক্ষুকদের অনুগমন করিল। ভিক্ষুকগণ তখন একটা জলাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিল, শতদল দূরে বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গেল—তখন বাবুদের বাড়ীতে একটা ঢোল হুড়হুড় করিয়া বেতালা বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে ভিক্ষুকগণ বাবুদের বাড়িতে ছুটিয়া গেল—ভিক্ষুকদের আসিবার সাঙ্কেতিক বাদ্য—পল্লীগ্রামে এইরূপ করিয়া বড় বড় কাজে সঙ্কেত করা হয়। শতদলও তাহাদের পাছু পাছু গেল। সেখানে পঁহুছিয়া যখন ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা লইতে লাগিল, শতদল পূর্ব্বাপেক্ষা সে দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া সাহস পূর্ব্বক দাঁড়াইল—কিন্তু যাচ্ঞা করিতে মুখ ফুটিল না হাতও উঠিল না;—একবার যেন হাতটি উঠিয়াছিল, কিন্তু তখনই তাহা পড়িয়া গেল—কেহ তাহা দেখিতে পাইল না—কেহ জানিল না শতদল ভিখারিণী।

সংসারের নিয়ম শতদল জানে না। চীৎকার না করিলে, গলাবাজি করিয়া বেড়াইতে না পারিলে ভিক্ষুক হইতে রাজার পর্য্যন্ত কাহারও জয় নাই, তাহা শতদল জানে না। গলার জোরে ঝুটা সাঁচ্চা হইয়া যায়, আর তাহা না থাকিলে সাঁচ্চা কাণা কড়িতে বিকায় না—তাহা শতদল জানে না। শতদল জানে—সান্ত্বনার পাত্রকে জগৎ আপনি চিনিয়া লইবে। লোক দেখাইয়া অশ্রুজল ফেলিতে হয়, তাহা হইলে জগৎ মহা আড়ম্বর করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী তোলপাড় করিয়া এক মুষ্টি অন্ন দেয়, তাহা শতদল জানে না। শতদল কখনও বাড়ীর বাহির হয় নাই—সে সংসারের ধার কি ধারে? যখন বাড়ির বাহির

হইল, তখন একেবারেই ভিক্ষা পাত্র লইয়া বাহির হইয়াছে। এত দিন ভিক্ষা দিয়া—এইবারে ভিক্ষা লইতে আসিয়াছে। কি করিয়া ভিক্ষা লইতে হয়, ভিক্ষা লইবার কি ধারা, তাহা সে জানে না—তা'ই সে ভিক্ষা পাইল না।

ভিক্ষা পাইবার আশায় বঞ্চিত হইয়া শতদল ধীরে ধীরে গ্রামের বাহির হইয়া পড়িলেন—দূরে সুপ্রবাহিতা পবিত্র শীতল জল ভাগীরথী তীরে একটা বটবিটপী তলে গিয়া বসিয়া পড়িল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। পূর্ণিমার চাঁদ মধ্য আকাশে রহিয়াছে, কৌমুদী প্লাবনে জগৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝাঁঝাঁ করিতেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শতদলের বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। নিকটেই জল—কিন্তু তবু যেন একটুকু শক্তি নাই—যে গঙ্গা তীরে গিয়া জলপান করে—শতদল শ্রান্ত ক্লিষ্ট অবসন্ন হইয়া সেই বৃক্ষতলে শুইয়া রহিল।

অদূরে ভাগীরথী তীরে বীণা ঝঙ্কারবৎ সুমধুর স্বর উঠিল, শতদল স্থির কর্ণ হইয়া সভয়চিত্তে তাহা শুনিতে লাগিল, কে মধুর স্বরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনন্তদেবের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অনেক পরে সে সুরভরা বীণার সুর থামিল, শতদল সে দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিল, দেখিতে দেখিতে একটী রমণী ফুলের মালায় ফুলের সাজে সুসজ্জিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া এলো চুলে ভিজে কাপড়ে সেই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি বৃক্ষতলে শতদলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—ধীরে ধীরে শতদলের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হাঁা গা তুমি কে?" শতদল—ভয়বিহ্বলচিত্তে মৃদু কণ্ঠে বলিল—"আমি ভিখারিণী" ভিখারিণী! এত রূপ একটা রাজার ঘরে নাই, ভিখারিণীর এত রূপ! রমণী অবাক্ হইলেন, সেই ম্লান

সৌন্দর্য্যে যেন অভিভূত হইলেন—সেই সুন্দর মুখখানি ম্লান বিষণ্ণ-শুষ্ক নলিনীর ন্যায় দেখিয়া তাঁহার চ'কে জল আসিতে লাগিল—অতি করুণার স্বরে বলিলেন, "এই দুপুর রাত্রে তুমি একা গাছতলায় প'ড়ে আছ, কোথায় যাইবে গা?" শতদল বলিল—"তা জানি না—কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই—হয় ত যমের বাড়ি।" সংসারাভিজ্ঞা রমণী বুঝিলেন, ইহার ভিতর অবশ্যই একটা রহস্য আছে, আরও বুঝিলেন, এ বালিকা, পাপ-তাপ-স্বার্থ পূর্ণসংসারপীড়িতা তাহাতে কিছুমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। বলিলেন "উঠে এস, আমার কুটীরে যাই"—শতদল বিনাবাক্যব্যয়ে উঠিল এবং ধীরে ধীরে রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——oo——

কুটিরে।

শতদল রমণীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে পঁহুছিলেন। সে বাড়িটি গ্রামের মধ্যে নহে—প্রান্তরে। বাড়ির চারি ধারে বেড়া, মধ্যে দুই খানি ক্ষুদ্র কুটীর। বাড়ীর মধ্যে ঘরের সম্মুখে একটা খুব বড় বকুলের গাছ—গাছের চারি পাশে লতার বিতান। নিম্নভাগে, বাড়ির উঠানে মেলা বকুলের পতিার রাশি পড়িয়া রহিয়াছে, বকুল গাছে বকুল ফুল ফুটিয়াছে—মৃদু বাতাসে কতক বা ঝরিয়া পড়িতেছে, নৈশ-সমীরণ মাতালের মত টলিতে টলিতে সে ফুলের গাদার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

রমণী শতদলকে দাওয়ায় বসিতে বলিয়া অপর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সে ঘর হইতে একটা দীপ জ্বালিয়া যে গৃহের দাওয়ায় শতদল বসিয়াছিল, সেই গৃহে আসিয়া দ্বার খুলিয়া শতদলকে গৃহ প্রবেশ করিতে বলিলেন, শতদল গৃহ প্রবেশ করিল। সে ঘরে একটা আলো জ্বালিয়া রাখিয়া রমণী অপর গৃহে চলিয়া গেল—শতদল গৃহের ভিতর একটা খট্টার উপর বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল,—ভাবিতে লাগিল "না জানি বিধাতা এ অদৃষ্টে আরও কি লিখিয়াছেন, এখন কোথায় যাইব? কে আমায় আশ্রয় দিবে? আমার আশ্রয় কোথায় গো!" বকুলের ডাল হইতে এই সময় একটা কোকিল ডাকিয়া উঠিল—সেও যেন কাঁদিয়া বলিল, "আমার আশ্রয় কোথায় গো!" বাতাস যেন সে কথার উত্তর দিল—সে যেন বলিয়া উঠিল "হুঁ হুঁ—মানুষের আশ্রয় কি মানুষে দিতে পারে? জগতের আশ্রয় দাতা তোমায় আশ্রয় দিবেন।"

এমন সময় সেই রমণী শতদলকে ডাকিতে গৃহে প্রবেশ করিল,—অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। শতদলের শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া রমণী বুঝিয়াছিলেন, উহার আহার হয় নাই, তাই কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া তাড়াতাড়ি রাঁধিতে গিয়াছিলেন—এখন অন্ন প্রস্তুত করিয়া শতদলকে ডাকিতে আসিলেন, শতদল উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে গেল, দুই জনে আহার করিতে বসিলেন। ক্রমে আহার সমাপ্ত হইল—আচমনাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া দুইজনে আসিয়া আবার পূর্ব্ব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী এ কথা ও কথার পর শতদলের বদন প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

শতদল। শতদল।

রমণী। তোমার বাড়ি কোথায় ?

শতদল। সদরপুর।

রমণী। তুমি এখানে—ও গাছতলায় অমন করিয়া পড়িয়া ছিলে কেন ? তোমাকে দেখিয়া ত তোমাকে কাঙ্গালিনী বলিয়া বোধ হয় না।

শতদলের চক্ষুতে জল আসিল—আঁচল দ্বারা চোকের জল মুছিয়া মৃদু কণ্ঠে ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা রমণীর সাক্ষাতে বিবৃত করিল।

রমণী শুনিয়া বলিল, "আমি তাহা তোমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছি, যে এত রূপ কখনই ভিখারীর ঘরে হয় না। যাহা হউক, তুমি অকিঞ্চিৎকর প্রেমের জন্য—আত্মসুখের জন্য—কেন গৃহ হইতে বাহির হইলে ?"

শতদল কিছু লজ্জিতা হইল, জড়িতস্বরে বলিল "আমি কি প্রেমের জন্য বাহির হইয়াছি ?—দেখিলাম গৃহে থাকিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়—স্বৈচারিণী হইতে হয়, কাজেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।"

রমণী। এখন কোথায় যাইবে ?

শতদল। তা আমি জানি না, ঈশ্বর যেখানে লইয়া যাইবেন, সেই খানেই যাইব।

রমণী। আমার এখানে থাকিবে ?

শতদল। রাখেন থাকিব।

রমণী। আমি ব্রহ্মচারিণী—সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিয়া ঈশ্বর ধ্যান করি, রাত্রি দ্বিপ্রহর হইলে গঙ্গায় স্নান করিয়া পূজা করিয়া তাহার পর রাত্রে আহার করি—তুমি তাহা পারিবে ?

শতদল। পরমানন্দে আমি তাহা করিব?

রমণী। সেত তোমার ধর্ম্ম নহে। তোমার বিবাহ হয় নাই, তুমিত এখন সম্পূর্ণ নহ। তোমার বিবাহ করা এবং বিবাহান্তে সেই স্বামী সেবাই ধর্ম্ম—অন্য ধর্ম্ম আর নাই। পতিমার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক পরম দেবতা রূপে স্বামীর সেবা ও স্বামীর ছায়া আশ্রয় করিয়া, পরম পাপবিনাশন পতিব্রতা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সাধ্বী রমণীর একমাত্র লক্ষণ। স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের স্বর্গ অপবর্গ বা পৃথক তীর্থ নাই। পতির দক্ষিণ পদ প্রয়াগ ও বাম পদ পুষ্কর বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং স্নানান্তে ভক্তিভরে তদীয় পাদোদক সেবন করিলে, পরমপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে; ভর্ত্তাই রমণীর প্রয়াগতীর্থ, ভর্ত্তাই তাহার পুষ্কর অথবা ভর্ত্তাই তাহার সর্ব্বতীর্থময়ী ভাগীরথী—তাহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চয় হয়—পতিব্রতা রমণী তৎসমস্ত লাভ করিয়া থাকে। স্বামী সেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের পৃথক ধর্ম্ম নাই। যে নারী স্বামীবিরহে একাকিনী অবস্থান করে, সে অর্দ্ধ মানবী। সে কখনও নমস্যা বা পূজনীয়া নহে। শাস্ত্রেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বামীর দক্ষিণাঙ্গ মহাতীর্থ। দান পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে যে ফল, স্বামী সহবাসে ততোধিক ফল সন্দেহ নাই। স্বামী সঙ্গম পবিত্র তীর্থ সেবা করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, কাশী, পুষ্কর, গঙ্গা ও গয়াদি তীর্থসেবাও তাদৃশ ফল প্রদানে সমর্থ নহে। স্বামীর পাদোদকই স্ত্রীলোকের সুখ, সৌভাগ্য, যশ, কীর্ত্তি ও তেজ প্রভৃতির অধিষ্ঠান। স্বামী সন্তুষ্ট হইলে স্ত্রী ভূ-স্বর্গীয়া নামে পরিগণিত ও সকলের নমস্যা হয়। পতিহীনা হইলে তাহার রূপ, যশ, সুখ, সম্পত্তি সকলই বিনষ্ট ও অসীম অসৌভাগ্য যোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বামী রুষ্ট হইলে সকল দেবতাই রুষ্ট ও স্বামী তুষ্ট হইলে সকল

দেবতাই তুষ্ট হয়েন। ফলতঃ স্বামীই স্ত্রীর গুরু, স্বামীই তীর্থ, স্বামীই পুণ্য, স্বামীই তপস্যা, স্বামীই পরম দেবতা, স্বামীই সৌভাগ্য, স্বামীই ভূষণ এবং স্বামীই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম।

স্ত্রীলোকের স্বামী সেবা ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। তাহা দুই প্রকার। প্রথমতঃ স্বামী জীবিত থাকিতে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তিনি যাহাতে সুখে থাকেন তাহা করিয়া—তাঁহার জন্য কার্য্যকরিয়া জীবন অতিবাহিত করা। দ্বিতীয়তঃ স্বামী বিয়োগ হইলে—(পূর্ব্বে সহমরণ প্রথা ছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে)—ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক সেই রূপ ধ্যান করা। উহা ভিন্ন স্ত্রীজাতির আর ধর্ম্ম নাই। অতএব তোমার পক্ষে এখন বিবাহই শ্রেয়স্কর।

শতদল এ কথা গুলি একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল, শুনিতে শুনিতে তাহার জল পড়া চোক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে বলিল" আমি যাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, যাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাকে ত পাইব না—তবে কেমন করিয়া বিবাহ করিব ?

রমণী।—কেন তাহাকে পাইবে না ?

শতদল। তাঁহাকে বিবাহ করিলে, বাবা তাঁহাকে রাখিবেন না—বাবা জমিদার, তিনি প্রজা।

রমণী।—তবে এখন ঘুমাও।

শতদল নিস্তব্ধ হইল—সে ক্ষুদ্র কুটীরও নিস্তব্ধতাবলম্বন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——00——

নানা কথা।

বাড়ীর লোক শতদলের অন্বেষণ অনেক করিয়াছিল, কিন্তু সে সংসার সমুদ্রে ভাসমানা ফুলের মালাছড়াটীকে আর কোথাও সন্ধান পায় নাই। নরেন্দ্রনাথ দিগের বাড়িতে গোপনে গোপনে অনেক সন্ধান হইয়াছিল,—সে কোথায় যায় কি না তাহার গোয়েন্দা বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলে নাই। তথাপিও হরকান্ত রায়ের দৃঢ় বিশ্বাস সেই পাষণ্ডের যোগেই তাহার কন্যা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—নতুবা সে অবোধ বালিকা কি বুঝে। নরেন্দ্রের উপর তাঁহায় ভারি রাগ হইয়াছে, এটা বুঝিতে আর কাহারও বাকি নাই। হরকান্তের বাটীতে নরেন্দ্রের মহা একটা দুর্নাম হইয়া পড়িয়াছে—কেহ বলে, নরেন্দ্র এখন চোর হইয়াছে, কেহ বলে আজ দেখে এলাম—নরেন্দ্র ভাঁটিতে বসিয়া সতের বোতল মদ খেয়েছে, কেহ বলে আর নরেন্দ্রের কথা কি বলিব—তাহার কি আর জাতি আছে, সে যথার্থই খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে—সে মুচিবাড়িও খায়, মুসলমান বাড়িও খায়। কেহ বলে তাহার জ্বালায় মালতী নগরের মুচিদের ঘর করা দায় হইয়া উঠিয়াছে,—সে মুচিদের বৌ ঝির উপর ভারি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের ঘরে ঢোকে, ঘাটে পথে দেখিলেই যা বলিতে নাই তাই বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ কথা বাড়ির মধ্যেও মহারাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে—সকলেই,

যাহারা আগে নরেন্দ্রকে বড় ভাল ছেলে বলিয়া জানিতেন, তাঁহারাও নরেন্দ্রের নামে দু'টা কলঙ্কের কথা না রটাইয়া জল খান না। সরোজিনী ভাবে, এমন দেবচরিত্র এমন হইয়া গিয়াছে? কি জানি বিধাতার এ কি লীলা!

ইহার মধ্যে রাগের ভাগটা রামদাস সেনের কিছু একটু বেশী বেশী রকমের হইয়াছে—কেন যে হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, তবে বোধ হয়, রামদাসের মত লোকের রাগটা কিছু একটু বেশী রকমের হয়।

রামদাস যাহার তাহার সাক্ষাতে নরেন্দ্রের কুৎসা করে—কখনও বলে তাহাকে কান ধরিয়া আনিয়া মারিতে হইবে। কখনও বলে তাহাকে মালতী নগর হইতে উঠাইয়া দিব। নরেন্দ্রনাথ লোক পরম্পরায় সে সকল কথা শুনিতেন, শুনিয়া ভাবিতেন পাগলে কি না বলিতে পারে। কিন্তু শতদলের চিন্তা তাঁহাকে বড় ক্লিষ্ট করিতেছিল। "সে কোথায় গেল, সে যে বালিকা—সে ত সংসারের কঠিনতা—স্বার্থপরতার বিষয় অবগত নহে। সে কেমনে কোথায় গিয়া কি অবস্থায় আছে, হয় ত সে আর ইহ সংসারে নাই—হয় ত দারুণ নিদাঘাতপতাপে সে কুসুম শুকাইয়া গিয়াছে।"

পল্লীগ্রামে প্রত্যহ বাজার বসে না, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে এক স্থানে হাট হয়। সেখানে চারি পাশের গ্রামের লোকেরা আসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রাখে—সপ্তাহের মধ্যে দুইদিন করিয়া হাট বসিয়া থাকে। মালতীনগরে হাট আছে, মালতীনগরের চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের লোকেরা মালতীনগরে আসিয়া বাজার করিয়া যায়।

আজ মালতীনগরের হাট। হাটে বহুতর লোক-সমাগম

হইয়াছে—ক্রেতা বিক্রেতায় হাট পূরিয়াছে। নরেন্দ্রনাথও হাটে আসিয়াছেন।

মালতীনগর হরকান্ত রায়দের জমিদারী—হাটখোলার মাঝখানে তাহাদের কাছারী ঘর। সেখানে একজন তহশীলদার, চারি জন পিয়াদা ও এক জন পাইক আছে। রামদাস সেন, সেদিনকার হাট করিতে অশ্বারোহণে হাটে আসিয়াছেন। কাছারী ঘরের দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া হুঁকা টানিতেছেন। এক জন চাকর হাটের মধ্যে হইতে শাক সবজি মৎস্যাদি কিনিয়া আনিয়া সেখানে রাখিয়া যাইতেছে। রামদাসের সম্মুখে এক জন দেশওয়ালী বসিয়া আছে। দেশওয়ালী সবে মাত্র বাঙ্গালা দেশে নূতন আসিয়াছে—কোথায় চাকরীর জন্য যাইতেছিল, রামদাসকে বাবু দেখিয়া তাঁহার নিকট চাকরীর উমেদারীর জন্য বসিয়াছিল।

রামদাস সেন গম্ভীর ভাবে বসিয়া তামাকুর ধূম পান করিতেছেন, সেই স্থান দিয়া নরেন্দ্রনাথ কার্য্যব্যপদেশে যাইতেছিলেন; রামদাস তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তামাক খাইয়া যান" নরেন্দ্রের যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোক ডাকিলে যাওয়াই ভদ্রতা। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ সে স্থানে গমন করিলেন এবং বিছানায় বসিলেন। রামদাস তাঁহার হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিলেন "তোমার নামে আমাদের সরকারে ভূরি ভূরি অভিযোগ পড়িতেছে, অতএব আমরা তোমাকে শাসন করিব।" নরেন্দ্রনাথের গম্ভীর শান্ত হৃদয়ও সে কথায় টলিয়া গেল; গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কি অভিযোগ?"

রামদাস। তুমি মদ খাও, লোকের মেয়েছেলের উপর জোরাবরি কর ইত্যাদি।

ঐ মিথ্যা দুর্নামে তাঁহার হৃদয়ে যেন শত বজ্রপাত হইল। নরেন্দ্র, "কে অভিযোগ করিয়াছে, আমি তাহা করি-নাই।" এরূপ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "অভিযোগের আপনারা কি শাসন করিবেন?"

রামদাসের কুটীলহৃদয়ে সে কথা বড় বাজিল, বলিলেন "জুতা মারিব?"

নরেন্দ্র। জুতা মারিবার আগে খাইতে হইবে।

রামদাসের আর সহ্য হইল না—সে একবারে সপ্তমে চড়িয়া আরক্তিম নয়নে, কাছারীর পিয়াদার উপর হুকুম ডাগিল "উস্কো বাঁদি বাচ্চাকো লাগাও জুতি।"

নরেন্দ্রনাথ সে মুহূর্ত্তে জগৎ শূন্য দেখিলেন, সে মুহূর্ত্তে পৃথিবী তাঁহার নিকট ঘোরান্ধকারে পরিণত হইল; চীৎকার করিয়া বলিলেন "হামারা কই হ্যায়রে?"

দেশওয়ালী বসিয়া বসিয়া তাহাদের ঝগড়া দেখিতেছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। যাহাদিগের ক্রোধনস্বভাব—পরের কলহেও তাঁহাদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়—সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিল—সে বলিল "হাম মহারাজ! হুকুম দেও।" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "লাগাও" দেশওয়ালী ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া আসিয়া রামদাসকে ধরিল। এবং যথোচিত প্রহারকিরিল। রামদাস প্রহারের চোটে একেবারে হত-জ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কাছারীর লোকেরা একবার দেশওয়ালীর প্রতি আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল—কিন্তু সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা পিছাইয়া গেল। হাটের সকলে নরেন্দ্র-নাথের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ জন্য রামদাসের উপর রাগিয়া

ছিল—তাহারা আর কেহ অগ্রসর হইল না। নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন, দেশওয়ালীও তাঁহার পাছু পাছু গেল।

গোমস্তাজী তখন রামদাসের মুখে জল ও গাত্রে বাতাস দিতে লাগিল—অনেকক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ পরে ক্রন্দনের সুরে বলিল, "তোমরা থাকিতে আমাকে খুন ক'রে গেল—"

এক জন পিয়াদা গোঁপে তা দিয়া গর্ব্বময় স্বরে বলিল, "কার বা ঘাড়ে সাতটা মাথা যে, আপনাকে খুন ক'রে যায়। আমি এখানে ছিলাম কি করিতে? যখন দেখিতাম আপনাকে খুন ক'রে ফেলেছে, তখনি এক বাড়িতেই দেশওয়ালী বেটার মাথা ভেঙ্গে দিতেম।"

আর এক জন বলিল "কি বলিব যে আপনি হুকুম দেননি, নতুবা কি আর উহাকে আস্ত রাখিতাম?"

আর এক জন বলিল "আমি মনে করিলে উহাকে খুন করিয়া ফেলিতে পারিতাম—তবে ও বেটার গায়ে বেশী জোর দেখিয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

রামদাস বলিলেন, আমাকে একখানি গাড়ি করিয়া দাও, ঘোড়ায় চড়িবার শক্তি আমার নাই। তাঁহাকে গাড়ী করিয়া দেওয়া হইল, তিনি গাড়িতে করিয়া সদরপুর চলিয়া গেলেন।

সদরপুর গিয়া হরকান্তের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি আপনার কথায় নরেন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া, সে আজ কাছারীতে পেয়ে আমাকে একবারে মেরে ফেলেছে, তাহার গাত্রে প্রহারের দাগ দেখিয়া হরকান্ত রায় একবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া গেলেন, তখনি নৌকা করিয়া রামদাসকে লইয়া জেলায়

ফৌজদারী করিতে চলিয়া গেলেন, বাড়ির মধ্যেও সে কথা পঁহুছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন প্রভাত।

যে দিবস হরকান্ত নরেন্দ্রের নামে ফৌজদারী করিতে গেলেন, সেই দিবস রাত্রে বৈকুণ্ঠ বাড়ি আগমন করিলেন। সরোজিনীর ও বাড়ির আর আর সকলের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত জানিলেন, সেই রাত্রেই তিনি মালতীনগরে নরেন্দ্রের নিকট গমন করিলেন, নরেন্দ্র তাহার নিকট সমস্ত কথা বলিলেন। বৈকুণ্ঠ শুনিয়া বলিলেন, "ঐ রামদাস বেটা কোথা হইতে জুটিয়া আমাদের সংসারটা ছার খার করিল। যাহা হউক তোমার নামের ফৌজদারী জন্য তত ভাবিতেছি না—উহা দুই একশত টাকা খরচ করিলেই মিটিবে, কিন্তু অভাগিনী মেয়ের পুত্তলি শতদল যে কোথায় গেল, তাহার কি হইল, তাহাই ভাবিতে আমার হৃদয় বিকল হইতেছে।" শেষে কাছারী আসিয়া গোমস্তার নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। সরোজিনী গোপনে লইয়া তাঁহাকে নরেন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। বৈকুণ্ঠ বলিলেন, "সে দেব-চরিত্র, দেব-চরিত্রই আছে।"

হরকান্ত ও রামদাস ফৌজদারী করিয়া তিন দিন পরে

সাটী আসিলেন। বৈকুণ্ঠ পিতার নিকট আসিয়া এ মারামারিতে রামদাস যে দোষী তাহা বলিলেন, তাহা প্রমাণ করাইবার জন্য মালতী নগরের গোমস্তা আনাইয়া প্রমাণ দিলেন, সে বলিল, "দোষ রামদাস্ বাবুরই।" কিন্তু তাহাতে হরকান্ত বাবুর রুদ্ধ উৎস খুলিল না, তিনি বলিলেন "আমি যাহাতে পারি, তাহাকে জেলে দিব।" বৈকুণ্ঠেরও তাহা সহ্য হইল না—সে বলিল, "আমিও যাহাতে পারি, তাহাকে উদ্ধার করিব।" বৈকুণ্ঠ বাপের কুকার্য্যের এইরূপেই ব্যাঘাত করিয়া থাকে, সে জন্য হরকান্ত তাহার উপর বড় অসন্তুষ্ট, তাহা আমরা প্রথমেই বলিয়াছি। হরকান্ত বলিলেন, "পাজী, তুই কিরূপে তাহাকে রক্ষা করিবি?"

বৈকুণ্ঠ। যেরূপেই পারি। তাহার জন্য জীবন দিব।

হরকান্ত। সে তোর কে? তাহার জন্য তুই অমন ক'রে মরিস্ কেন?

বৈকুণ্ঠ। সে ধার্ম্মিক, সে পরোপকারী, সে শান্ত, সে নির্ম্মল, সে আমার বন্ধু—সে আমার পূজনীয়।

বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠের হৃদয় কি একরূপ ভাবে পরিণত হইল—চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল; পিতার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা!" সে নির্ম্মল হৃদয়ে আর যাতনা দিওনা বাবা! যথেষ্ট হইয়াছে—কাল রামদাসের কুমন্ত্রণায় যথেষ্ট করিয়াছ, আর না বাবা। ভাবিয়া দেখদেখি তাহাকে কি বিপদময় স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—সে ধার্ম্মিক, তাই ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। আবার শতদল কোথায় গেল, কি হইল তাহার ঠিকানা নাই, হয় ত সে আপনার কঠোর প্রতিজ্ঞায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে—হয় ত সে স্নেহপুতুলীকে আর কখনও দেখিতে পাইব না!"

এই করুণ খেদোক্তিতে হরকান্তের হৃদয় গলিল না, বরং ক্রোধের বৃদ্ধি হইল, আরক্তিম মুখমণ্ডল আরো রক্তবর্ণ ধারণ করিল—এক পদাঘাতে বৈকুণ্ঠকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন—বৈকুণ্ঠ আর কথাটিও কহিল না। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। হরকান্ত একাকী সেই নিভৃত গৃহে বসিয়া রহিলেন, বলিতে লাগিলেন "কাহারও কথা শুনিব না, কাহারও অনুরোধ রাখিব না, অর্থের দিকে তাকাইব না,—নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে জেলে দিব।" মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—হঠাৎ এক তেজস্বী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে প্রতিভাসিত হইল—তাঁহার জলন্ত দৃষ্টিতে, তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল! সন্ন্যাসীর নাম জ্ঞানদাস।

সন্ন্যাসী যখন হরকান্তের নেত্র হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন, তখন আবার হরকান্ত বলিয়া উঠিলেন, "পুত্রের অনুরোধও শুনিব না, নিশ্চয়ই তাহাকে জেলে দিব।" আবার সন্ন্যাসী তাঁহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, হরকান্ত দেখিলেন, নরেন্দ্র সদ্বংশজ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুন্দর পুরুষ তাঁহার বামে তাঁহার স্নেহের কন্যা শতদল বসিয়া। সে সৌন্দর্য্যে তাঁহার দৃষ্টি ঝলসাইয়া গেল; আরও দেখিলেন, তাহাদিগকে,—সেই নবদম্পতী যুগলকে রামদাস খড়্গাঘাত করিতে যাইতেছে—হরকান্ত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "খয়ের আলি!"—খয়ের আলি—দরোয়ান! সে বাবুর বিকৃত স্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া সেলাম বাজাইল, বলিল, "খোদাবন্দ, হুকুম হয়?" হরকান্ত বিকৃতস্বরে বলিলেন, "অনেক দিন আমার নিমক খাইয়াছিস্। আজ কি আমার উপকার করিবি? রামদাস আমার মেয়ের উপর অত্যা-

চার করিতেছে, তুই শীঘ্র তাহার মাথা আমায় এনে দে।” দরোয়ান “যো হুকুম খোদাবন্দ” বলিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ভাবিল, “একি ব্যাপার! যে বাবু রামদাসকে প্রাণের দোসর দেখেন, আ’জ তাহার উপর এরূপ হুকুম কেন?” আরও ভাবিলেন “বাবুর মেয়েত কোথায় পালিয়ে গিয়েছে, তবে রামদাস কাহার উপর অত্যাচার করিল।” ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে দেখে রামদাস তাহার সম্মুখে, সে রামদাসকে দেখিয়া কতকগুলা গালিগালাজ করিল, রামদাস মহা অপমানিত হইয়া বাবুর নিকট নালিশ করিতে গেল। দরোয়ান রামদাসকে প্রহার করিল না,—ভাবিল বাবু বুঝি কোঁন নেশা টেশা করিয়াছেন তাই ওরূপ হুকুম দিয়াছেন,—কিন্তু মধ্যে মধ্যে রামদাস দরোয়ানের উপর রাগ করিয়া তাহাকে গালাগালি দিত, এজন্য সে সময় পাইয়া তাহার প্রতিশোধটা তুলিয়া লইল। এ দিকে রামদাস বাবুর নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল, “দরোয়ান আমায় গালাগাল দিয়াছে” হরকান্ত তখনও সেই ভাবে বসিয়া। তিনি দেখিলেন, রামদাস তাহার সম্মুখে আসিয়াছে—তাহাকে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর কিলি বিলি করিয়া উঠিল—বলিলেন “পাষণ্ড! নরেন্দ্রের উপর অত্যাচার নরেন্দ্র আমার জামাতা, কই, এখনও দরোয়ান তোর মুণ্ডচ্ছেদ করে নাই? শালা, পাজী ছুঁচো, তুই এখনি আমার বাড়ি হইতে দূর হ—, নতুবা এখনি তোর মাথা যাইবে।” রামদাস অবাক্ হইয়া শুনিল—শুনিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া মনে মনে ভাবিল “বড়র ভালবাসা আর বালির বাঁধ, দুইই সমান, সে দুঃখে অপমানে একেবারে সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এখন সন্ন্যাসী আবার হরকান্তের দেহ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া

লইলেন। তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি যেন একটা গম্ভীর স্বপ্নের মাঝখানে জাগিয়া উঠিলেন—বলিলেন, কি করিয়াছি, কি করিয়াছি—রামদাস! রামদাস! আমি জানিনা, কি জন্য তোমায় অপমান করিলাম—আমার প্রতি রাগ করিও না ভাই, ফিরে এস।” তখন সন্ন্যাসী তাহার নিকট সরিয়া আসিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে হরকান্তের মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিয়া বলিলেন—“বৎস! এক মুহূর্ত্তে সবই গোল করিয়াছ। ভাল বৎস! এত স্বার্থপরতা, দুর্ব্বলের প্রতি যে এত ঘোর অত্যাচার করিতেছ, মরিতে কি হইবে না—তোমার পিতা পিতামহ এ জমিদারী করিতেন, এখন তাহারা কোথায়? বৎস! মোহে অকুষ্ঠিতচিত্তে যেকাজ করিতেছ—অন্ধকারময় পাপকে আলোক বলিয়া ধরিতে উদ্যত—সে মোহ, সে ভ্রান্তি কি ভাঙ্গিবে না?” বলিয়া সে মূর্ত্তি ক্রমে মিশাইয়া পড়িল। হরকান্ত চমকিয়া উঠিলেন, সত্যের একটা আলোক বিদ্যুৎপ্রবাহের মত তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া, হৃদয় ভস্ম করিয়া দিয়া, চলিয়া গেল—পরক্ষণেই গভীর একটা অন্ধকার হৃদয় অধিকার করিল। ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। একাকী সেই দগ্ধ হৃদয় লইয়া অনুতাপের আশ্রয়ে থাকিয়া সে রাতটুকু অতিবাহিত করিলেন—যখন প্রভাত হইল তাহার অশ্রুজলের মধ্য দিয়া উষার নবরাগ যখন ফুটিয়া উঠিল, তখন তাহার জীবনের তিনি নূতন প্রভাত দেখিতে পাইলেন।

— — —

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীপ নির্ব্বাণ।

ঝটিকা তরঙ্গায়িত অন্ধকার নিশীথে এক খানি ছই ঘেরা নৌকা আসিয়া গঙ্গাতীরে লাগিল; মাঝিরা নামিয়া তীরে কাছি বান্ধিয়া দ্রুতপদে কাঁপিতে কাঁপিতে নৌকার ভিতর গেল।

ক্রমে অন্ধকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া নিজ করাল-গ্রাসে বিশ্ব চরাচর গ্রাস করিয়া মুহুর্মুহু বজ্র হুঙ্কার ছাড়িতেছে। বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, নদী তরঙ্গায়িত করিয়া ভূলোক, দ্যুলোক কম্পমান করিয়া বিদ্যুতের অট্ট হাসি হাসিতেছে। তাহার সহিত প্রাণপণে যুঝিতে যুঝিতে প্রকৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; বৃক্ষ শাখা ভাঙ্গিয়া দুম্ দাম করিয়া নৌকার অতি নিকটে পড়িতে লাগিল। গাছে বজ্র আসিয়া পড়িতেছে ধু ধু গাছ জ্বলিয়া উঠিতেছে—তাহা দেখিয়া নৌকারোহীগণের প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে—এমন সময় ভারি একটা দম্‌কা বাতাস আসিল। সে বাতাসে নৌকা খানি উল্টাইয়া পড়িল। নৌকা-রোহীদিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, যে যে দিক হইতে ফাঁক পাইল, সে সেই দিক দিয়া বাহির হইয়া প্রাণভয়ে যে যে দিকে সুবিধা বুঝিল, সে সেই দিকে ছুটিল। এক জন ছুটিতে ছুটিতে দেখেন অদূরে মিটমিট করিয়া দীপ জ্বলিতেছে—ঊর্দ্ধ-শ্বাসে তিনি সেইখানে আসিয়া দেখিলেন যে একটী বাড়ি, বাড়ির মধ্যে গৃহদ্বারে গিয়া ডাকিলেন "ঘরে তোমরা কে আছ

গো; আমায় বাঁচাও, আমি ম'লাম।" এ বাড়ি সেই রমণীর,—শতদলের আশ্রয় দাত্রীর।

থাকিয়া থাকিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, এক একটা বড় বাতাসের দমকা সেই স্তব্ধ গৃহটাকে নড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাই-তেছে। নীরব স্তম্ভিত ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ একটা গভীর গম্ভীর ভীষণতা ঢালিয়া দিতেছে। সেই মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে বাহির হইতে কে অতি করুণ স্বরে ডাকিল—"ঘরে কে আছ গো, আমায় আশ্রয় দাও—আমি বড় বিপন্ন।" গৃহের মধ্যে সেই রমণী ও শতদল কথোপকথন করিতেছিলেন, ঐ স্বর তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ হইবামাত্র তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিলেন—একটা বাতাসের দমকা আসিল—গৃহস্থিত দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

রমণী তাড়াতাড়ি চকমকি ঝাড়িয়া আগুন করিতে গেল—চক্‌মকির পাত্রে হাত দিয়া দেখে, পড়ুয়া গৃহের চালের ছিদ্র দিয়া জল পড়িয়া সে পাত্র পূরিয়া রহিয়াছে। রমণী মহাদুঃখিত হইল—এ মাঠের মধ্যে আর কোথাও আগুন পাইবার যো নাই। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "আ'জ সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম যে, বিপন্ন অতিথির সেবা করিতে পারিলাম না।" শেষে দরজায় দাঁড়াইয়া আগন্তুককে সে কথা জানা-ইলেন, এবং দুঃখ প্রকাশ করিলেন, আগন্তুক বলিলেন, "আমায় একখান শুষ্ক বস্ত্র ও একটা বিছানা দিন, আমি দাও-য়ায় শুইয়া থাকি—আ'জ আর কিছু খাইব না।" অগত্যা রমণী তাহাই করিলেন—আগন্তুককে কাপড় ও বিছানা দিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া শুইলেন—শুইয়া শতদলকে বলিলেন হাঁ কি বলিতেছিলে?

শতদল—হাঁ বলিতেছিলাম, স্ত্রীলোকের কি কোন কর্ম্মই নাই ?

রমণী—তা বইকি যেস্ত্রী তাহার নিজের জন্য কার্য্য করে, সে পাপিষ্ঠা। গৃহস্থালী বল, ধন ঐশ্বর্য্য বল, পুত্র কন্যা বল, গহনা কাপড় বল, স্ত্রীলোকের সকলি স্বামীর জন্য। সমস্ত দিবস কার্য্য করিয়া—যজ্ঞান্তে যেমন সে কর্ম্মের ফল হরি চরণে সমর্পণ করে—তেমনি স্ত্রীজাতি স্বামী চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে—ইহাই ধর্ম্মের কথা। যে স্ত্রী গহনার জন্য—ভাল কাপড়ের জন্য বা ঐরূপ কোন দ্রব্যের জন্য স্বামীকে যাতনা দেয় বা স্বামীর উপর রাগ করে, শাস্ত্রে তাহাকে অসতী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এবং সে মরিয়া সাপিনী হয়। যাহাতে স্বামী সুখে থাকেন, যাহাতে স্বামীর কোন কষ্ট না হয়, সাধ্বীস্ত্রীর প্রাণপণে তাহাই করা কর্ত্তব্য—কদাচ স্ত্রীগণ আত্মসুখের জন্য কার্য্য করিবে না।

শতদল—যাহারা পাপ পুণ্য না মানে ?

রমণী—ছিঃ, তাহাদের কথায় কাজ কি। পাপপুণ্য মানে না, এমন যদি কেহ থাকে, তবে তাহাদের জন্য সে ব্যবস্থা তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন ? মা! তোমার মতন তিনি ক্ষুদ্র দর্শী নহেন, এ জগতে যে যাহা করে, তাহা তিনি সর্ব্বদাই দেখিতেছেন।

গৃহের ভিতর কথোপকথন হইতেছে, আগন্তুক বাহির হইতে তাহা শুনিতে পাইতেছিল, তাহার নিকট শতদলের স্বর যেন কত পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, সে স্বর যেন অন্তস্তল স্পর্শ করিতে লাগিল—তাহার উপর পাপ পুণ্যের কথা। তিনি বলিলেন—"যে পাপ করিয়া বুঝিয়াছে আমি পাপী, তাহার উদ্ধারের উপায় ?"

সে স্বর শতদলের কর্ণে পঁহুছিল—সে স্বর যেন, তাঁহার জীবনের আশ্রয়—বলিলেন "অনুতাপ—পাপেবিরত, পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান—ঈশ্বর উপাসনা।"

আগন্তুক মনে ভাবিলেন—"অনুতাপ, পাপেবিরত, পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান—ঈশ্বর উপাসনা।"

আর কোন কথা বার্ত্তা হইল না। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

তাপসী-কণ্ঠহার।

প্রত্যূষে উঠিয়া রমণী ও শতদল দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। দেখিলেন, বাহিরে শুধু বিছানা পড়িয়া রহিয়াছে, আগন্তুক সেখানে নাই—উঠিয়া গিয়াছে। রমণী কিছু দুঃখিত হইলেন, মনে ভাবিলেন অতিথি উপবাস করিয়া চলিয়া গেলেন, থাকিলে এ বেলা রাখিয়া আহারাদি না করাইয়া যাইতে দিতাম না। শতদল দুঃখিত হইল, ভাবিলেন, "সে পরিচিত স্বরে—জীবন পবিত্র করার বিধি কথা কহিলেন, তিনি কে তাহা দেখিতে পাইলাম না।" তার পর দুই জনাই নিজ নিজ কার্য্যে রত হইলেন।

ক্রমে বেলা হইল, রোদ উঠিল, চারি দিকে লোক জন সব ব্যস্ত ভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় এক জন ভদ্রলোক আসিয়া সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

রমণীকে বলিলেন, "আপনার সাক্ষাতে না বলিয়া আমি উঠিয়া গিয়াছিলাম,—আমার নৌকা কাল ঘাটে ডুবিয়া গিয়াছিল; মাঝিরা কে কোথায় গিয়াছিল—তাহারা আসিয়াছে কি না, তা'ই দেখিতে গিয়াছিলাম।"

রমণী বুঝিলেন, ইনিই কালি রাত্রে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, "তাহারা সকলে আসিয়াছে?"

আগন্তুক। হাঁ—তাহারা আসিয়া নৌকাটি তুলিয়াছে, এখন আমি বিদায় প্রার্থনা করি।

রমণী। না—আপনি কা'ল উপবাসী ছিলেন, আ'জ আহারাদি করিয়া যাইবেন।

আগন্তুক। আমাকে আ'জ যাইতেই হইবে, অনেক দিন বাড়ি ছাড়া,—এক ছেলেমানুষের ঘাড়ে খুব ভার চাপাইয়া আসিয়াছি।

শতদল স্নান করিতে গিয়াছিল—সে আসিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিয়া জলপূর্ণ মাটির কলসী ফেলিয়া দিয়া আগন্তুকের পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! বাবা! তুমি এখানে কোথা হইতে এলে?"

আগন্তুক হরকান্ত রায়—হরকান্তেরও চক্ষু দিয়া জল পড়িয়া বুক ভিজাইয়া তুলিল—বলিল, "শতদল, মা আমার! আমি তোমায় কত কষ্ট দিয়াছি মা! মা! চল বাড়ি যাই—তোমার নরেন্দ্রনাথ ভাল আছেন, চল মা তোমার নরেন্দ্র-সহগামিনী করিয়া দেইগে। হাঁ মা! এ দাসিকা বাসে এ ভাগসী কেন সেজেছিস্ মা?"

রমণী এ রহস্যের মর্ম্ম বুঝিলেন,—বলিলেন, "কণ্ঠহার নিবার জন্য।"

হরকান্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "দেবলীলা বুঝিয়াছি—শতদলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার জন্য আমার অতদূর দুর্মতি হইয়াছিল—এখন চল মা তাপসি! তোমার কণ্ঠহার দেইগে।"

রমণী হরকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিক্ষিতা তাপসীর কণ্ঠহার যে, সে কেমন?"

হরকান্ত বলিলেন, "প্রকৃতির স্বভাব শিক্ষিত দেব-চরিত্রবান।"

রমণী। আশীর্ব্বাদ করি, তাপসী-কণ্ঠহার সুসংশ্লিষ্ট হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ সুখে সংসার করুক।

তাহার পর, সে বেলা সকলে সেখানে আহারাদি করিয়া বৈকালে নৌকায় উঠিলেন; দু'দিনের পর নৌকা সদরপুর পঁহুছিল—সকলে শতদলকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। হরকান্তের মোহের মুহূর্ত্ত চলিয়া গিয়াছে—এখন নিজেই নরেন্দ্র নাথের বাড়ি গিয়া তাঁহাকে আনিয়া শতদলের সহিত বিবাহ দিলেন।

* * * * *

শতদল নরেন্দ্রের বাড়ী নীত হইলেন—নরেন্দ্র ও শতদলে গভীর বিরহের পর সম্মিলিত হইলেন—ইহাতে যে তাঁহারা কত আনন্দিত, কত সুখী হইলেন, তাহা সামান্য লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। শতদলের বিবাহের দু'মাস পূর্ব্বে বসন্তকুমারীর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল; শতদল তাহাকে লালন পালন, স্বামীসেবা শাশুড়ীর সেবা ও বসন্তকে আপনার সহোদরার ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন।

গৃহকার্য্য ও সংসারের অন্যান্য কার্য্যের ভার প্রায় সমস্তই শতদলের উপর পড়িল—শতদলও যথারীতি তাহা সম্পন্ন করিতে

লাগিলেন। শাও তাঁকে স্নানাহার না করাইয়া, নিজে স্নানাহার করেন না। বসন্ত গহনা না গায় দিলে, নিজে গহনা গায় দেন না। সে ভাল কাপড় না পরিলে, নিজে ভাল কাপড় পরেন না। বসন্তের ছেলেকে আর বসন্তের দুধ খাওয়াইতে হয় না, স্নান করাইতে হয় না, কোলে নিতে হয় না—সে সমস্তই শতদল করিয়া থাকে। নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই অধিকক্ষণ শতদলের গৃহে থাকেন, তাহাতেও শতদল বাধা দেয়, বলে, "বসন্তের ঘরে না গেলে সে দুঃখ পাবে।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

——oo——

উপদেশ।

এততেও বসন্তকুমারীর মনে সপত্নী দ্বেষানল অহরহ জ্বলিতে লাগিল। সে ভাবে স্বামী আমায় ভাল বাসেন না, তিনি শতদলকেই ভাল বাসেন; তবে শতদল আমাকে ভাল বাসিতে নিতান্ত অনুরোধ করে—তাই তিনি মুখে আমাকে একটু ভাল বাসা দেখান, তা'কি হয়, ধ'রে বেঁধে ভালবাসা, আর ঘসে মেজে রূপ; যাহা হউক যাহাতে স্বামী আমার বশীভূত হয়েন, আমি তাহার উপায় করিব—আমি স্বামীকে জ্ঞান করিব। পাড়ার হরিবৈষ্ণবের মা,—লোকে বলিত সে খুব জ্ঞান যোগ জানে—গোপনে বসন্তকুমারী তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তাহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া তাহার নিকট হইতে স্বামী বশের ঔষধ লইলেন—অমাবস্যা শনিবার সেই দিনে সন্ধ্যার সময় এলোচুলে ঘরের এক কোণে বসিয়া বসন্ত ঔষধ বাটিতে আরম্ভ

করিয়াছে, সেই সময় শতদল কার্য্যব্যপদেশে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল—দেখিতেই বুঝিল, বসন্তকুমারী স্বামী-বশে ঔষধ বাটিতেছে। হাসিয়া বলিল, বসন্ত! ও ঔষধে স্বামী বশ ত হয় না, আমি তোমায় ঔষধ দিব "আঃ পোড়াকপাল হতভাগী ছুঁড়ী আবার কোথা হইতে শুনিল" মনে মনে ভাবিয়া থত মত খাইয়া বলিল, "তা—তা।"

শতদল। "ছিঃ! বসন্ত, তুমি উহা এখনি ফেলিয়া দাও, স্বামীবশের মন্ত্র আমি তোমায় শিখাইয়া দিতেছি।

বসন্ত সে গুলা ফেলিয়া দিল। শতদল বলিল, "স্বামী বশের একটা উপাখ্যান মহাভারত হইতে তোমাকে শুনাইতেছি, অভিহিত চিত্তে শুনিয়া যাও ইহাতেই স্বামী বশ হয়।

একদা কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা বনবাসী পাণ্ডবদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা দ্রুপদরাজনন্দিনীর অদ্ভুত পতিসৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণে! আমি তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—বলিতেই হইবে। তোমার লোকপালতুল্য পতিগণ সকলেই তোমার মুখাপেক্ষী, সকলেই তোমার প্রতি সমান অনুরক্ত, কেহ তোমার প্রতি কখনও কোন প্রসঙ্গে কুপিত হন না। ইহার কারণ কি? তাহা তুমি আমার নিকট অকপট চিত্তে বল। তুমি কি কোন ব্রত, না তপস্যা, না যোগ, না মন্ত্র, না ঔষধ জান—যাহাতে তোমার স্বামীগণ তোমাতে এত অনুরক্ত? তুমি কি জান যে, তদ্দ্বারা তোমার স্বামীগণ তোমার প্রতি এত অনুরক্ত?"

দ্রৌপদী প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'সত্য! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সাধ্বী স্ত্রীর উপযুক্ত নহে। অসাধ্বী ও হীনমতি রমণীরাই

তদ্রূপ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। তুমি কৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী, তোমার এরূপ বুদ্ধি কেন? তুমি কি জান না যে, মন্ত্রৌষধির দ্বারা পতিবশ-কামনা অন্যায়। পতি নারীগণের প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি মহৌষধি দ্বারা বশ হন না। পত্নীর সদাচার ও সদনুষ্ঠান দেখিলেই তাঁহারা প্রীত হন, অন্যথা কুপিত হন। মহৌষধির দ্বারা হিত হওয়া দূরে থাকুক, কেবল অহিত ঘটনাই হয়। স্বামী যদি জানিতে পারেন যে, স্ত্রী ডাকিনীর ন্যায় মন্ত্র তন্ত্র অনুসন্ধান করে—তাহা হইলে তাঁহার আর উদ্বেগের পরিসীমা থাকে না। গৃহে সর্প থাকিলে যেরূপ উদ্বেগ হয়—স্বামী মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞা স্ত্রীকে দেখিলেও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হয়েন।

"স্বামী বশ্য হইবে" এই আশায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেকে অনেক সময়ে অতি অহিত ঘটাইয়াছেন। যে নারী স্বামীকে বশ করিবার আশায় ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাঁহাপেক্ষা দুর্ম্মতি আর নাই। তাদৃশী অসতী ও অনভিজ্ঞা নারীরা শত্রুর আনন্দের দ্বারস্বরূপ। শত্রুগণ তাদৃশী অসতী স্ত্রীর দ্বারা আত্ম-মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে।

তাদৃশী দুরভিলাষিণী দুরাচারী অসতী নারীর দ্বারা স্বামীর অনেক সময়ে অনেক অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে। বশ করিতে গিয়া অর্থাৎ বশীকরণ প্রত্যাশায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেক সময়ে অনেক নারী স্বামীকে অতি কঠিন ব্যাধিমুখে নিপাতিত করিয়াছেন। উদর রোগ, উন্মাদ, শিরঃ দুষ্ট ও অন্যান্য ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত করাইয়া অবশেষে অকালে কাল-কবলে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, অসতী নারীরা স্বামীকে বশীভূত করিতে গিয়া অবশেষে জড়, বধির ওমূক করিয়া

ফেলিয়াছে। স্ত্রীর দুরভিলাষ চরিতার্থের নিমিত্ত স্বামীর শক্তি বৃদ্ধি করিতে গিয়া ক্লীবত্বে পরিণত করিয়াছে। যাহারা পাপিষ্ঠা ও পাপশীলা তাহারাই কৌশলে স্বামীর বশীকরণ অনুসন্ধান করে; কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মশীলা ও গুণবতী, তাঁহারা উল্লিখিত উপায়কে অতিশয় ঘৃণা করেন। সত্যে! অধিক কি বলিব? যদ্দ্বারা স্বামীর অণুমাত্র অনিষ্ট সম্ভব না থাকে, তাহার উল্লেখ করাও অকর্ত্তব্য। লোকপাল তুল্য পতিগণের প্রতি আমি যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা বলি--শ্রবণ কর।

আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার শূন্য হইয়া অতি সাবধানে পতি সেবা করিয়া থাকি। ঈর্ষ্যা ও মানাভিমান ত্যাগ করিয়া পতিসন্তোষের জন্য সপত্নী পুত্রগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। যে কোন প্রকারে হউক, পতির মনোঽনুবর্ত্তন করাই সাধ্বী স্ত্রীর কার্য্য।

পতি পাছে দুর্ব্বাক্য বলেন, পাছে দুঃখিত হন, পাছে কুদৃষ্টিতে দেখেন, পাছে ভোজনে অতৃপ্ত হন, পাছে গমনে ক্লেশ পান, পাছে কোন ইঙ্গিত করেন, এ আশঙ্কা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে রাখি এবং ভয় রাখিয়া সেবা করি।

দেবতাই হউন, গন্ধর্ব্বই হউন, মনুষ্যই হউন,—পতি ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি, যুবা, সর্ব্বালঙ্কার সুশোভিত, ধনবান ও পরম সুন্দর হইলেও তিনি আমার নিকট অপূজ্য ও অস্পৃহনীয়।

ভর্ত্তা ভোজন না করিলে আমি ভোজন করি না, স্নান না করিলে আমি স্নান করি না, শয়ন না করিলে আমি শয়ন করি না, নিদ্রিত না হইলে আমি নিদ্রা যাই না। অধিক কি, ভৃত্য প্রভৃতি অবশ্য পোষ্যবর্গেরা আহার না করিলে আমি আহার করি না এবং নিদ্রিতা হই না।

ভর্ত্তা যুদ্ধ স্থান হইতে, কি কোন ক্ষেত্র হইতে কি কোন দূরপ্রদেশ হইতে আসিলে আমি প্রত্যুদ্গমনাদির দ্বারা তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি এবং নিজে আসনাদি দান দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকি।

গৃহ—গৃহের দ্রব্যাদি যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, খাদ্য সকল যাহাতে উত্তম ও গুণবৎ হয়, কোন প্রকার ক্ষতি বা অপচয় না হয়, তৎপক্ষে সর্ব্বদা সাবধান থাকি এবং তাঁহাদের ভোজন অতিক্রান্ত না হয়, এরূপ রাখিয়া ভোজন করাইয়া থাকি। ভবিষ্যতে খাদ্য সকল সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি।

আপদই হউক, সম্পদই হউক, কখন কর্কশ স্বর বা কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করি না। দুঃশীলা ও দুরাচারা রমণীর সহবাস বা তাহাদের সহিত ক্রীড়া করি না। আলস্য শূন্য হইয়া সর্ব্বক্ষণই পতির আনুকূল্য করি ও তাঁহাদের চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া থাকি।

তাঁহাদের অভিলষিত কৌতুকস্থল ভিন্ন অন্য কোন সময়েই তাঁহাদের সম্মুখে হাস্য ও উচ্চহাস্য করি না। দ্বারদেশে কি গবাক্ষ-প্রদেশে (জানালায়) বসিয়া থাকিনা। কার্য্যব্যতীত মনোরম স্থানে দাঁড়াই না। অসময়ে কোন গুপ্ত স্থানে গমন করি না। একা হইলে গৃহোদ্যানেও অধিকক্ষণ থাকি না।

অতি হাস্য ও সর্ব্বদা হাস্য আমার নিকট আদর পায় না। দুঃখ হইলেও মুখ মলিন করিয়া থাকি না। কখনও অতি ক্রোধ করি না—এবং ক্রোধের স্থানেও থাকি না। সখি সত্যভামে! আমি ঐ রূপ ব্রত অবলম্বন করিয়া নিরন্তর পতিসেবায় নিযুক্ত আছি। স্বামীর বিচ্ছেদ বা স্বামী পরিত্যাগ করিয়া থাকা আমার একদণ্ডের জন্যও ভাল লাগে না। ভর্ত্তা যদি কোন কারণে

প্রবাসী হন—আর তিনি যদি অনিচ্ছা প্রকাশ না করেন—তবে আমিও তাঁহাদের সেবার জন্য প্রবাসিনী হই। ভর্ত্তা যদি প্রবাস ব্রত ধারণ করেন—তাহা হইলে আমিও প্রবাস ব্রত ধারণ করি অর্থাৎ পুষ্পমাল্য ও অনুলেপনাদি সমস্তই পরিত্যাগ করি।

স্বামী যাহা আহার করেন না, পান করেন না, বা ব্যবহার করেন না; আমিও তাহা খাই না, পান করি না, বা ব্যবহার করি না। তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য আমি সমস্ত উপভোগ বর্জ্জন করি এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি।”

“প্রিয় ভগ্নি বসন্ত! তুমিও দ্রৌপদীর ঐ উপদেশ মত কার্য্য কর, স্বামী তোমার বশীভূত হইবেন—আর স্বামীও তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন—তবে কেন দুষ্টা নারীর ন্যায় স্বামীকে যোগ জ্ঞান করিতে চাও? মন্ত্র ঔষধে স্বামী বশ হয়েন না—ইহাত শুনিলে, আর কদাচ যেন ওমতি করিও না।”

বসন্ত বলিল “না—আমি আর কখনও অমন মতি করিব না—আমি স্বামী বশীভূত করিবার জন্য—তোমার কথা মত কার্য্য করিব।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সুখের সংসার।

শতদলের সদুপদেশে বসন্তের হৃদয় হইতে স্বামী বশের বাসনা অন্তর্হিত হইল—সে উপদেশমত সর্ব্বদা স্বামীর সেবা

করিত। স্বামীর বিন্দুমাত্র পরিশ্রম হইলে, সে পরিশ্রম তাহার হইয়াছে জ্ঞান করিত—আত্মবিস্মৃত হইয়া যতক্ষণ না স্বামীর পরিশ্রম দূর হয়, ততক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিত।

শতদল স্বামী-সেবা, শাশুড়ীর শুশ্রূষা, বসন্তের ছেলেকে দুধ খাওয়ান, স্নান করান এ সমস্ত কার্য্য, গৃহের সমস্ত কর্ম্মাদি অতি সু-শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বসন্তকে বিবাহ করিয়া কিছু অর্থপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা প্রথমে সামান্যরূপে হরিদ্রার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহাতে কিছু লাভ হইল, একগুণে দশগুণ হইল। তাহার পর তাহা দ্বারা হরিদ্রা ও পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে পাট যখন খরিদ হয়, তখন যে দর ছিল, এখন তাহার অর্দ্ধেক দরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ব্যবসাদারগণ মাথায় হাত দিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ সবেমাত্র এইবার প্রথমে পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন, বেশী নহে হাজার দশেক টাকার মাত্র পাট কিনিয়া রাখিয়াছিলেন—দেখিতেছেন, তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা প্রায় লোকসান যায়। তাঁহার যত যাইতেছে—তাহা হইতে বড় বড় মহাজনদের আরও যাইতেছে। সকলেই দুঃখিত, সকলেই চিন্তিত। এক দিন নরেন্দ্রনাথ নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! এ দেশে পাট পাওয়া যায়?" নরেন্দ্র কহিলেন, "কত মণ?" "যত পাই, তাহাই লইতে পারি।" দরের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন, তাঁহাদিগের ক্রীত দরের উপরও এক টাকা। নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি প্রচুরপরিমাণে পাট দিতে পারি।' তাহারা লেখা পড়া করিয়া লইয়া

বায়না করিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথও দেশে যত পাটের মহাজন ছিল, সকলকে ক্রীত মূল্যের উপর চারি আনা মণপ্রতি লাভ দিয়া সমস্ত পাট বায়না করিলেন। তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া টাকা দিয়া পাট লইয়া গেল—পাটের লাভে নরেন্দ্র লক্ষাধিক টাকা পাইলেন।

নরেন্দ্রনাথ এখন খুব ধনী হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্বভাব সেই পূর্ব্ববৎ দরিদ্র-ভাবাপন্ন, তেমনি বিনীত। নরেন্দ্রনাথের বিধবা ভগ্নী বিনোদ এখন নরেন্দ্রনাথের বাটিতেই অবস্থান করিতেছে। শতদলের গুণে ননদভাজে যে একটা ঈর্ষা-সদৃশী ভাব থাকে, তাহা নাই—সকলেই যেন এক মায়ের পেটের মেয়ে। সকলে কত প্রণয়, কত প্রীতি, দেখিলে চক্ষুর তৃপ্তি হয়—মনের আনন্দে আপনা ভুলিতে হয়। এইরূপে সুখের সংসারে অনন্ত প্রপীড়িত সকলে অনন্তসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল। শতদলের আর সন্তানাদি হইল না—সে তাহাতে এক বিন্দুও অসুখী নহে—সে বলে "বসন্তের ছেলেগুলি হউক, তাহাতেই আমার হইবে। উহার ছেলের আর আমার ছেলের কি প্রভেদ আছে?"

* * * * *

ফাল্গুনমাস সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—বসন্তের মাতাপবন মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতেছে। বসন্তের নব ফুট ফুটে জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া গিয়াছে—ফুলগাছগুলি ফুটন্ত ফুলে সাজিয়া গুজিয়া জ্যোৎস্না-বিধৌত হইয়া, মৃদু বাতাসে দুলিতেছে—রজনীগন্ধার সৌরভে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই সময় নরেন্দ্রনাথ একখানি পত্র হস্তে শতদলের কক্ষে

প্রবেশ করিলেন। শতদল তখন সাঁঝের কাজ কর্মাদি সমাপ্ত করিয়া, বসন্তের ছেলেকে আহার করাইয়া ঘুম পাড়াইয়া কেবল নিজগৃহে আসিয়া একখানি বই খুলিতেছিলেন। নরেন্দ্র-নাথকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি, শ্যামচাঁদের অসময়ে নিকুঞ্জে আগমন কেন?"

নরেন্দ্র। (হাসিয়া) ভয় নাই—কার্ত্তিক মাস নয় যে রাস হবে—ফাল্গুন মাস দোলে উঠিবে।

শতদল। (মৃদু হাসিয়া) রাধিকা উঠিবে চন্দ্রাবলীর তাহাতে অধিকার কি? রাস হ'ত সকলেই উঠিতান।

নরেন্দ্র। কে চন্দ্রাবলী? তুমি না বসন্ত? তুমি রাধা, সে চন্দ্রাবলী।

শতদল। সে শুনিলে রাগ করিবে। এখন অসময়ে আগমনের কারণটা কি বল দেখি?

নরেন্দ্র। তোমার কাছে আসিতে সময় অসময় দেখিতে হইবে না কি? কাল অবধি পঞ্জিকা দেখিয়া আসা যাবে?

শতদল। (মৃদু হাসিয়া) তা এস—এখন খবর কি বল দেখি?

নরেন্দ্র। খুব একটা ভাল খবর, বৈকুণ্ঠ বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন, তোমাকে লইতে আগামী কল্য লোক আসিবে এই পত্র নাও।

শতদল। আর পত্র লইয়া কি করিব? পাঠাইয়া দিবে ত।

নরেন্দ্র। বৈকুণ্ঠ বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে পাঠাইব না? অবশ্য পাঠাইব।

নরেন্দ্রনাথ পালঙ্কোপরি বসিলেন, দুই জনে মহাভারত খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

* * * * * *

পরদিন প্রত্যুষে সদরপুর হইতে শোয়ারি ও লোক আসিল। শতদল শোয়ারিতে উঠিয়া সদরপুর পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

* * * * *

হরকান্ত রায় জ্ঞানদাস সন্ন্যাসীর সহ সাক্ষাতের পর দিন হই, তেই কেমন একরূপ হইয়া গিয়াছেন,—আর তাঁহার সে রূপ সংসারে আঁট নাই। গরীব প্রজার রক্তশোষণ করিয়া কর সংগ্রহ করা নাই—এখন দুঃখীর দুঃখ দেখিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া জলের রাশি গড়াইয়া পড়ে, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদে—তিনি এখন আর জমিদার নহেন তিনি এখন বৈরাগী। জমিদারীর ভার, সংসারের ভার, এখন বৈকুণ্ঠ বাবুর উপর।

জ্ঞানে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়। এত দিন জগৎ সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিষ হরকান্তের মাথার উপর ভারের মত চাপিয়া ছিল, আজ জ্ঞানের সময় সহসা যেন সমস্ত মাথার উপর হইতে উঠিয়া গেল। চন্দ্র সূর্য্য আকাশ আর হরকান্তকে বেরিয়া রাখে না, সুখ দুঃখ আশা স্বার্থপরতা আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখে না জ্ঞানের উন্মেষে মানুষের নিকট হইতে ক্ষুদ্র জিনিষের গুরুত্ব একবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্ত্তে আবিষ্কৃত হয় যে,—আমরা যাহাকে এত দিন স্বাধীন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম, তাহা ত বন্ধন নহে, তাহা ত লূতা-তন্তুর মত বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল; বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই—ধরা না দিলে কেহ ধরিয়া কাহাকে রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতি দিনের সুখ দুঃখ, প্রতি দিনের ধূলারাশি আমাদের চারি দিকে ভিড়ি

রচনা করিয়া দেয়, জ্ঞানের এক ঝটিকায় সে সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আর অনন্ত রাজপথে বাহির হইয়া পড়ে। এত দিন হরকান্ত প্রতিদিনের মানুষ ছিলেন, এখন তিনি অনন্ত কালের জীব, এত দিন হরকান্ত বাড়ি ঘর দুয়ারের জীব ছিলেন, এখন তিনি অনন্তজগতের সীমা হীনতার মধ্যে বাস করেন। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিতেন, তাহারা তত আপনার নহে, সেই জন্য তাহাদিগকে বেশী করিয়া আদর করেন—মনে করেন, এ পান্থশালা হইতে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিব, এ দু'দিনের সৌহার্দ্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে। যাহাদিগকে নিতান্ত পর মনে করিতেন—তাহারা তত পর নহে, এই জন্য তাহাদিগকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। এতদিন তাঁহার চারি দিকে একটা গণ্ডী আঁকা ছিল, সে রেখাটাকে দৃঢ় প্রাচীরের অপেক্ষা কঠিন মনে হইত, তিনি হঠাৎ জ্ঞানদাসের সাহায্যে উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখেন- সেটা কিছুই নহে, গণ্ডীর ভিতরেও যেমন, বাহিরেও তেমন। আপনিও যেমন পরও তেমন। আপনার লোকও চিরদিনের তরে পর হইয়া যায়, তখন একজন পথিকের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার সহিত সে সম্বন্ধও থাকে না।

জ্ঞানদাসের সহযোগে হরকান্ত এইরূপ ভাবে বিভোর হইয়াছেন, প্রথম দিন কতক চিত্তের নূতন ভাবে তিনি বড় উদাস হইয়াছিলেন, তাই নৌকা করিয়া নির্জ্জন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—প্রায় দুই মাস ভ্রমণের পর বিপদাক্রান্ত হইয়া শতদল যে রমণীর কুটীরে থাকিত, সেই ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহা পাঠক জানেন। সে নির্জ্জন ভ্রমণের আর একটু কারণ ছিল—অনুতাপ।

বৈকুণ্ঠ এখন পিতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া একটা ক্ষুদ্র কার্য্যও করেন না—পিতাও এখন পুত্রের ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রত্যেক-কার্য্য অতি সুন্দর চক্ষে—প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

বৈকালের রোদ পড়িয়া গিয়াছে—এই সময় বৈকুণ্ঠ পিতার নিকট বসিয়া অন্নপ্রাশনে যেরূপ যাহা যাহা করিতে হইবে তাহার পরামর্শ লইতেছেন; দেওয়ানজীও সেখানে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছেন। এমন সময় একটী দাসী আসিয়া বলিল, "শতদল বলিয়া দিলেন, খোকার ভাতে তিনি নিজ হইতে পাঁচ হাজার দুঃখীর প্রত্যেককে একজোড়া কাপড় দিবেন ও এক বেলা আহার করাইবেন—আপনারা একটা প্রচার করিয়া দিন।" বৈকুণ্ঠ ও হরকান্ত শতদলের ভিখারিণী অবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠের চোক দিয়া জল পড়িল। তাহা দেখিয়া হরকান্ত বলিলেন, "বাপ! বুঝিয়াছি, এক দিন শতদল ভিখারিণী হইয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—তাহাতে হতাশাস হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড় কষ্ট পেয়ে ছিল, তাই ভাবিয়া কাঁদিলে—কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি—সে দুঃখটুকু না পাইলে, আজ দুঃখীর জন্য শতদলের হৃদয় কি কাঁদিত—কে উহাকে এ অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইয়া দিত? অতএব দুঃখই উন্নতির মূল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পরিশিষ্ট।

সরোজিনী, শতদল, মনোরমা প্রভৃতি যুবতীগণ নিভৃত কক্ষে সন্ধ্যার পর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। সরোজিনী

কথায় কথায় বলিল, "শতদল! আশা ছিল না যে, তুমি নরেন্দ্র সোহাগিনী হ'বে, আশা ছিল না যে, তুমি আবার আমোদ প্রমোদ করিবে।"

শতদল। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

মনোরমা। এই জন্য আমি যে দিন আগের বার এখানে এসে সইয়ের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিবাহের কথা বলে ছিলাম শতদল অসুখ হ'য়েছে ব'লে গিয়ে শুয়ে প'ল্লেন—আমি ত আগে এত জানিতাম না?

শতদল হাসিয়া বলিলেন, "মনোরমে! আজ আর একটী গান গাও।"

মনোরমাও হাসিয়া বলিল "হাঁ আবার গান গাই, আবার তুমি অসুখ হইয়াছে বলিয়া শুইয়া পড়।"

শতদল। (হাসিয়া) পড়ি পড়িব, তুমি এখন গাও।

মনোরমা বলিল "তুমি বাজাও।"

শতদল একটা বাঁয়া লইলেন, সরোজিনী হারোমনিয়মে সুর দিতে আরম্ভ করিলেন, মনোরমা গাইতে লাগিল;—

বেঁধে রেখে ছিনু মন, যতন ক'রে;—
আর ত না পারিলাম বসন্তের জোরে।
মুঞ্জরিল তরুগণ,
সাজিল প্রমোদ বন,
উড়ে অলি, নাচে শিখি, হরিণী চরে,
প্রাণের ভিতরে মোর, কেমন করে।
দখিনা বাতাস বয়,
ট'লে পড়ে ফুল চয়,
কাপে ধীরে তরু-লতা, ঝুরু ঝুরু ক'রে;
পরাণ বুঝাতে গেলে পোড়া আঁখি ঝোরে॥

আকাশে তারকা-রাশি,
প্রেমে ডগ মগ হাসি,
চুমিছে চাঁদের মুখ মেঘের থরে,
প্রাণের ভিতরে এবে কেমন করে।
নাচিছে যমুনা ধীরে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে চাঁদ ফিরে,
ঘুমা'য়েছে ধরা-সতী সমীর ভরে;
পরাণ বুঝাতে গেলে পোড়া আঁখি ঝোরে।
ফুট ফুটে জোছনায়,
ধরাখানি ভেসে যায়,
মৃদু বায়ে ফুলগুলি ঝুরু ঝুরু ঝরে,
সে নলিনী বিনে প্রাণ কেমন করে।

অনেক ক্ষণ পরে গীত সমাপ্ত হইল—সে মধুরস্বর নিস্তব্ধতায় মিশিয়া গেল। শন্দলাল বলিল, "আর একটী গাও।" আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে মনোরমার হারোমনিয়ম-লাঞ্ছিত কণ্ঠ-স্বর উঠিল, মনোরমা গাহিল;—

ধীরে ধীরে দখিনা বায়ু
ঐ আসছে ছুটে পুটে,
কেন লো গোলাপ বালা, ঘোমটা দিয়ে,
রহিয়াছ বসিয়া লো,
আসছে বায়ু ঐ দেখলো,
তোর কচি-হৃদয়খানি দে খুলে লো।
যাক্ খেয়ে সে মধুররাশি লুটে পুটে!
ওকি তোর হাসি রাশি কেন হ'ল অশ্রুময়?
মরুৎ তোর কাছে এসে,

কইল কথা হেসে হেসে,
উঠ্‌লিনে ত্বলো সে পরশে,
কেন ঝ'রে পড়্‌লি—হাসি তোর গেল টুটে ?
বুঝেছি গোলাপ বালা,
ডেকেছিস্‌ সারা বেলা,
আসেনি এত বেলা—তাই অভিমানে পড়্‌লি লুটে।
ফুটবি মনে ক'রে ক'রে,
অভিমানে পড়্‌লি ঝ'রে,
বাতাসটুকু উদাস প্রাণে চ'লে গেল কেঁদে উঠে।

আবার সে স্বর নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। গীত সমাপ্ত হইল।

ক্রমে অন্নপ্রাশনের দিন আসিল—সে দিন মহাসমারোহে আমোদ আহ্লাদে কুটুম্ব সাক্ষাতের, দীন দুঃখীর সমাগমে, তৃপ্তিকর ভোজনে, গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতির আলোচনায় সে দিন অতিবাহিত হইল। কুটুম্ব সাক্ষাৎ ক্রমে ক্রমে সকলে স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া গেল। শতদলকে লইতেও লোকেরা আসিল সরোজিনী শতদলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "শতদল! ভুলনা, মধ্যে মধ্যে এস!" শতদল "আসিব না—তোমার কাছে, দাদার কাছে, মার কাছে, বাপের কাছে, আপন বাড়ীতে আসিব না!" শেষে অনেক বলাবলি কাঁদা কাটির পর শতদল মালতীনগরে গমন করিলেন। বসন্তের ছেলেটি বড়মা আসিয়াছে মালতীনগরে গমন করিলেন। বসন্তের ছেলেটি বড়মা আসিয়াছে বলিয়া বড় আহ্লাদিত হইল—ছুটিয়া আসিয়া শতদলের কোলে উঠিল। বসন্ত আসিল—সেও আহ্লাদিত। সকলেই শতদলের আগমনে সুখী হইলেন—গৃহের লক্ষ্মী গৃহে আসিলেন।

সম্পূর্ণ।